# মুসলিম রমণী

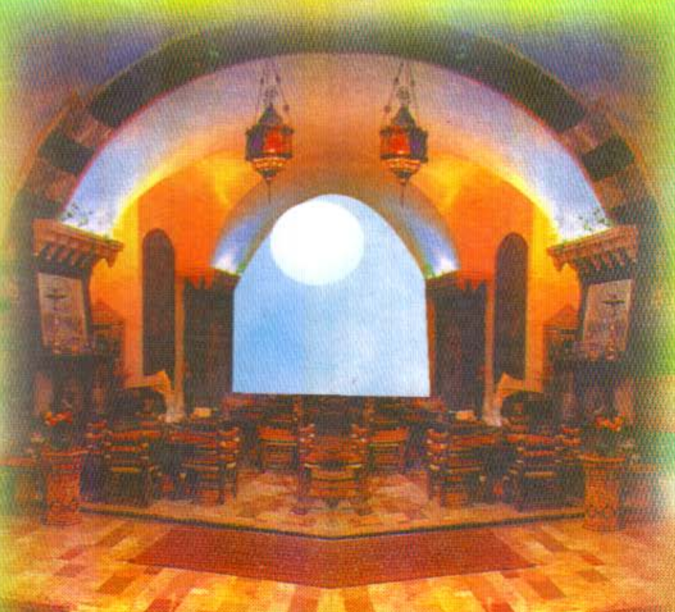

# মুসলিম রমণী

রচনায়
মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুল হক

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তফা
এম. এম

পরিবেশনায়
আল্-মাহমুদ প্রকাশনী
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৫৫.০০ টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
আধুনিক ছাপাখানা
শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠানং |
|---|---|
| নর-নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ | ৯ |
| নারী ঃ প্রাচীন সমাজে | ১১ |
| ভারত | ১১ |
| চীন | ১১ |
| গ্রীস | ১২ |
| রোম | ১২ |
| আরব | ১৩ |
| ইহুদীবাদ | ১৪ |
| খ্রিষ্টধর্ম | ১৪ |
| ইসলামে নারীর মানবাধিকার | ১৫ |
| নারীর ধর্মীয় মর্যাদা | ১৯ |
| নারীর উত্তরাধিকার | ২১ |
| নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য | ২৪ |
| পুরুষের তুলনায় নারীর অর্ধেক অংশ | ২৫ |
| নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র | ২৭ |
| মেয়েদের চাকুরী | ২৯ |
| বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি | ৩৩ |
| স্বামীর আনুগত্য | ৩৩ |
| অবাধ মেলামেশা বর্জন | ৩৫ |
| জ্ঞানার্জন | ৩৭ |
| নারী শিক্ষা ঃ পুরুষের দায়িত্ব | ৩৭ |
| জ্ঞানচর্চায় নারীর অবদান | ৩৯ |
| হযরত আয়েশা (রাঃ) গোটা উম্মতের শিক্ষয়ত্রী | ৩৯ |
| দীন প্রচারে হযরত সাফিয়্যার অবদান | ৪১ |
| হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) অবদান | ৪১ |
| রাবী বিনতে মুআওয়েযের (রাঃ) অবদান | ৪২ |
| ফাতেমা বিনতে কায়েসের (রাঃ) অবদান | ৪২ |
| আমেরা বিনতে আবদুর রহমানের (রাঃ) অবদান | ৪২ |
| পর্দা | ৪৩ |
| নারীর দায়িত্ব | ৪৭ |
| গর্ভাবস্থা | ৪৭ |
| প্রসবকাল | ৪৭ |
| স্তন্যদানকাল | ৪৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠানং |
|---|---|
| লালন-পালন | ৪৮ |
| নারী পুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য | ৪৯ |
| রোমান সভ্যতায় পর্দা | ৫২ |
| বিবাহ | ৫৫ |
| সমতা | ৫৫ |
| মোহর | ৫৮ |
| মোহর আদায়ের নির্দেশ | ৫৯ |
| স্ত্রীর জন্য মোহরানা দাবী করা দোষণীয় নয় | ৫৯ |
| স্ত্রীকে মোহরানা মাফ করতে বলা | ৫৯ |
| যৌতুক প্রথা | ৬০ |
| অলিমা | ৬১ |
| অলিমার সুন্নত নিয়ম | ৬৩ |
| নবী-পত্নীগণের অলিমা | ৬৩ |
| হযরত ফাতেমার (রাঃ) অলিমা | ৬৩ |
| বিয়ের আনন্দ | ৬৩ |
| পরিণয়-নিষিদ্ধ নারী | ৬৫ |
| স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার | ৬৮ |
| স্বামীর উপর স্ত্রীর হক | ৭০ |
| সার সংক্ষেপ | ৭২ |
| স্ত্রী ও মাতা-পিতার হকের মাঝে ভারসাম্য | ৭২ |
| স্ত্রীর জন্য পৃথক ঘর | ৭৩ |
| স্ত্রীকে আপনজন থেকে দূরে রাখাই নিরাপদ | ৭৩ |
| স্বামী মৃত স্ত্রীর মুখ দেখতে পারে | ৭৪ |
| একাধিক বিবাহ | ৭৪ |
| একাধিক স্বামী | ৭৫ |
| সন্তান সমস্যা | ৭৬ |
| নারী জীবনে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার | ৭৭ |
| অনৈসলামিক আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদ | ৭৯ |
| একাধিক বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব | ৭৯ |
| একাধিক বিবাহ সংক্রান্ত মাসআলা | ৮০ |
| একাধিক বিবাহ ঃ অনুমতি দানের মহৎ উদ্দেশ্য | ৮১ |
| তালাকঃ বিভিন্ন ধর্মে | ৮৩ |
| তালাক অপছন্দনীয় | ৮৬ |
| তালাকই মুক্তির একমাত্র পথ নয় | ৮৭ |
| ঋতুকালে তালাক প্রদান নিষিদ্ধ | ৮৯ |
| তালাকের শিষ্টাচার | ৮৯ |
| তালাকের প্রকার | ৯০ |
| নিয়ত ছাড়াও তালাক কার্যকর হয় | ৯০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠানং |
|---|---|


| বিষয় | পৃষ্ঠানং |
|---|---|
| ইদ্দত | ৯১ |
| আকিকা | ৯২ |
| কুসংস্কার | ৯৩ |
| পাশ্চাত্যের চালচিত্র | ৯৩ |
| সহশিক্ষা | ৯৩ |
| জারজ সন্তান | ৯৪ |
| মদ্যপান | ৯৫ |
| সতীত্বের বিকিকিনি | ৯৬ |
| হলিউডে নির্মিত ছবি | ৯৭ |
| নারী স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও কুরআন | ৯৮ |
| অজাচার, বিজ্ঞান ও কুরআন | ১০০ |
| মহিলাদের নামায সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য মাসায়েল | ১০২ |
| নামায | ১০২ |
| কেয়াম (দাঁড়ানো) | ১০২ |
| রুকূ | ১০৩ |
| সেজদা | ১০৩ |
| কাদাহ বৈঠক | ১০৩ |
| মহিলাদের নামায সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর | ১০৪ |
| কযেকটি সমকালীন প্রশ্নের জবাব | ১০৭ |
| নাপাক চর্বি দ্বারা প্রস্তুতকৃত সাবান | ১০৭ |
| লিপিষ্টিক পাউডার ও ক্রীম ইত্যাদি ব্যবহার | ১০৮ |
| সহবাসের পর সমস্ত চুল ধোয়া প্রয়োজনীয়তা | ১০৮ |
| চুম্বন অজু ভঙ্গের কারণ কিনা? | ১০৮ |
| মাসিকের সময় কুরআন তেলাওয়াত | ১০৮ |
| মাসিকের সময় মুখস্ত কুরআন তেলাওয়াত | ১০৯ |
| হাদিস মুখস্ত করা ও কুরআনের তরজমা পাঠ | ১০৯ |
| মাসিকের সময় কুরআন বিষয়ক পরীক্ষা | ১০৯ |
| মাসিকের সময় ছাত্রী শিক্ষিকার পাঠদান সমস্যা | ১১০ |
| মহিলাদের উপড়ে যাওয়া চুল | ১১০ |
| ওয়াশিং মেশিনে ধোলাইকৃত কাপড় | ১১১ |
| নাপাক জায়গা শুকিয়ে গেলে | ১১১ |
| কাপড়ে কুকুরের স্পর্শ | ১১১ |
| নারীর মর্যাদা সম্বলিত হাদিস | ১১২ |
| জান্নাতের পথ | ১১২ |
| শহীদ খেতাব | ১১২ |
| জান্নাতে প্রবেশ | ১১২ |

| বিষয় | পৃষ্ঠানং |
|---|---|
| মায়ের অনন্যসাধারণ মর্যাদা | ১১২ |
| তিনটি শিশুর মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারিণী | ১১৩ |
| দোজাহানের কল্যাণ | ১১৩ |
| উত্তম মহিলা | ১১৩ |
| উত্তম মহিলা | ১১৩ |
| তাহাজ্জুদ পাঠকারিণী ও তার পানির ছিটা | ১১৩ |
| উপকারী বস্তু | ১১৪ |
| আল্লাহর কর্মী | ১১৪ |
| হুরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব | ১১৪ |
| হাজার পুরুষের চাইতে উত্তম | ১১৪ |
| সদাচারের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি | ১১৪ |
| আস্বাদে প্রাধান্য | ১১৪ |
| নারীশিশু হত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা | ১১৫ |
| সংখ্যাধিক্য | ১১৫ |
| সত্তরগুণ অধিক সুন্দরী | ১১৫ |
| আর সেই মহিলাও জান্নাতী | ১১৫ |
| গুনাহ্ ঝরে পড়ে যে কারণে | ১১৬ |
| অর্ধদীন লাভের মাধ্যম | ১১৬ |
| অকালে গর্ভচ্যুত সন্তানের মাতা | ১১৬ |
| কাজের মর্যাদা | ১১৬ |
| মহিলার নেকী | ১১৭ |
| জাযাকাল্লাহু আন্নী খাইরান | ১১৭ |
| বিধবা নারীর মর্যাদা | ১১৭ |
| মিথ্যা | ১১৭ |
| কন্যা সন্তানের মর্যাদা | ১১৮ |
| আদর-সোহাগে সাম্য | ১১৮ |
| কন্যাই যার প্রথম সন্তান | ১১৮ |
| কন্যার ব্যয়ভার গ্রহণ | ১১৮ |
| বিধবার জান্নাত | ১১৮ |
| ধৈর্যধারণকারিণী মহিলা | ১১৯ |
| উত্তম মহিলা | ১১৯ |
| সাহসী ভূমিকা | ১১৯ |
| মহিলার দৃষ্টান্ত | ১১৯ |
| দ্বিগুণ সাওয়াব | ১১৯ |
| স্বামী আনুগত্যের মর্যাদা | ১২০ |
| স্ত্রী সহবাসের বিনিময় | ১২০ |
| মায়ের পদতলে | ১২০ |

উপহার

# আমাদের প্রকাশিত কতিপয় ধর্মীয় বইসমূহ

- সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া
  বা বিশ্ব নবীর জীবনী
- নূরুল ঈযাহ্ আরবী-বাংলা
- মালাবুদ্দা মিন্হু-
  এবারতসহ বঙ্গানুবাদ
- ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে
- নারী তুমি কি চাও
- সহীহ্ নূরানী নামায শিক্ষা (বড়)
- সহীহ্ নূরানী নামায শিক্ষা (ছোট)

এছাড়া মাদ্রাসার যাবতীয় কিতাব ও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ, কুরআন শরীফ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

# নর-নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ

নর ও নারী মানব জাতির দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। একে অপরের পরিপূরক। সমগুরুত্ব ও সমমর্যাদার অধিকারী। কেউ কারো চাইতে নিচু নয়, হীন নয়। নারী যেমন পুরুষবিহীন চলতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন পুরুষও নারীর সঙ্গ উপেক্ষা করতে পারে না। সমাজ জীবনে নর-নারী পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগী সহমর্মী হয়ে উঠবে, সাথে সাথে প্রাকৃতিক যৌন চাহিদার ভিত্তিতে পরস্পর লাভ করবে অনাবিল সুখ-শান্তি এটাই স্বাভাবিক।

পক্ষান্তরে নারী-পুরুষের এই স্বভাবগত সম্পর্কের যদি ঘটে অবনতি। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের সামাজিক সম্পর্ক-সহাবস্থান, অবাধ উচ্ছৃংখল যৌন আরচণ পরিবেশ ও সমাজকে করে ফেলে কলুষিত, লক্ষ্যচ্যুত, ভারসাম্যহীন। তবে তা হয় মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। বিশ্বব্যাপী মরণব্যাধি এইডসের ভয়াবহ সর্বগ্রাসী রূপ কী আমাদেরকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না?

এ প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের স্বভাবসম্মত সম্পূরক জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্যতার বিষয়টি প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের কাছেই যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে তা বলাই বাহুল্য। তবে স্মর্তব্য যে, এ ক্ষেত্রে নর-নারীর যৌন সম্পর্কের বিষয়টি সভ্যসমাজ বিনির্মাণে একেবারেই পরিত্যক্ত হবে কিংবা যৌন বিমুখ মানব সভ্যতা গড়তেই আমাদের সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে এমন তো নয়। বরং নর-নারীর স্বাভাবিক যৌন চাহিদার পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান অপরিহার্য। এটি বৈধতার মর্যাদা না পেলে স্তব্ধ হয়ে যাবে সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা। ধসে পড়বে তিল তিল করে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী ভিত্তিপ্রস্তর। অতীত ইতিহাস থেকে এ বাস্তব সত্যই আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালের বিশ্বের সভ্যতাগর্বী তাবৎ উন্নত-অনুন্নত অঞ্চলগুলোতে নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের কি চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি, পুরুষের বিপুল-বিশাল কর্মক্ষেত্রে নারীকুলের স্বচ্ছন্দ পদচারণা। ফলে উন্নতি অগ্রগতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও রাখছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং দেওয়াও হচ্ছে উভয়কে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা, কর্মোদ্দীপনা। অথচ তাদের উভয়ের যোগ্যতা-কর্মদক্ষতা সমমান সম্পন্ন নয়—একথা আমাদের কারুরই বোধগম্য হচ্ছে না।

উনবিংশ শতাব্দীর এনসাইক্লোপেডিয়ায় বলা হয়েছে, 'নারী-পুরুষের যৌনাঙ্গের গঠন-আকৃতির পার্থক্যই মূখ্য হলেও তা কেবল এ একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, নারীর আপাদমস্তক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। সর্বোপরি নারী পুরুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেগুলোকে একই ধরনের মনে করা হয়, কার্যত সেগুলোও সামঞ্জস্যহীন।

এ গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে, 'বস্তুত নারীর শারীরিক গঠন শিশুর শারীরিক গঠনের ন্যায়। এ কারণেই শিশুর মত নারীর অনুভূতিও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শিশুর নিয়ম হলো, দুঃখ-বেদনার কোন কিছুই তারা সহজে মেনে নিতে পারে না, কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। পক্ষান্তরে আনন্দ সুখের কিছু দেখা মাত্রই খুশীতে লাফাতে আরম্ভ করে।'

বস্তুত নারী পুরুষের এই বিপরীতধর্মী দেহাবয়ব আর শক্তি-সামর্থের প্রাকৃতিক বিভাজন উভয়ের কর্মক্ষেত্রের মাঝে রচনা করেছে বিভেদের দেয়াল। এঁকে দিয়েছে চিন্তা ও কর্মের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা। একজনকে করেছে গৃহমুখী, অন্যজনকে বহির্মুখী।

কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়– কী প্রাচ্য, কী পাশ্চাত্য– সর্বত্রই জীবন-জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত নারী-পুরুষ অবাধে একই কর্মক্ষেত্রে ছুটে আসছে। এ পরিস্থিতিতে প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ও তার প্রতি ঔদাসিন্যের দরুন অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের কথা ভেবে দেখবার কারুরই যেন ফুরসত নেই।

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নারী-পুরুষের এই ভারসাম্যহীন অবস্থান, তথা জীবিকার খাতিরে ঘরের বাইরের কর্মতৎপরতায় নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ সমাজ কাঠামো। যা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত সর্বপ্রকার ভাঙন আর বিপর্যয়ের অন্ধকার গহবরে নিক্ষেপ করছে। শান্তি-সুখের পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ আর আধুনিক প্রযুক্তির সুলভ ব্যবহার সত্ত্বেও শোষণ-বঞ্চনার ভয়াবহ যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি আমরা।

এ প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত এক নতুন সমাজ কাঠামো বিনির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যার ভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুয়ের ভিত্তির উপর যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তা হবে উচ্ছৃংখলতার আবিলতামুক্ত এক শোষণ-বঞ্চনাহীন ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ঘৃণ্য ব্যবস্থার ভিত ধ্বসে পড়ার পর বর্তমানে ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন বিকল্প পথ আমাদের জানা নেই।

এ পর্যায়ে আলোচনার জন্য আমরা প্রথমে যুগে যুগে নানা ধর্মে, সম্প্রদায়ে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করবো। তারপর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রজাতির মর্যাদা অধিকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

# নারী ঃ প্রাচীন সমাজে

## ভারত.

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনুস্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করে, তখন নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা ও যৌনকর্মে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধপ্রবণতা দান করে। তাকে মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযোগী বলে ঘোষণা দেয়। ফলে হিন্দু সমাজে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, নারী হচ্ছে সকল পাপ-পঙ্কিলতার জড়। তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক-জাহান্নাম।[১]

মনুশাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে ঃ

"অনুগত স্ত্রী হল সে, যে তার স্বামীর সেবা এভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোন কথা না বলা যা তার জন্য দুঃখজনক হয়– তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাসই হোক না কেন। কেন না কেবল এ জন্যই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তাঁর সাথে বড়জোর একটি মাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না। বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট খাবে।[২]

## চীন.

চীনে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চীনারা তাদের নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। উচ্চ পর্যায়ের এক চীনা মহিলা নিজ সমাজে নারীর মর্যাদা-অবস্থান প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

"আমাদের নারীদের স্থান মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতি নিম্নে। তাই আমাদের অংশ এসেছে সবচাইতে নিকৃষ্ট কর্ম।"

নারী পর্যালোচনায় তিনি আরো বলেনঃ

"নারী কত হতভাগিনী। পৃথিবীতে বোধ করি তার মত মূল্যহীন বস্তু অন্যকিছু নেই। ছেলেরা দোরমুখে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে

১. বিশ্ব ইতিহাস, পৃষ্ঠা, ৩৯৪
২. হামারাতুল হিন্দ, পৃষ্ঠা, ১৭৯

আগত কোন দেবতা। কিন্তু মেয়েদের জন্মক্ষণেও আনন্দের শানাই বাজে না। যখন তারা বড় হয় তখন তাদের বদ্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়, যাতে কোন মানুষ তাকে দেখতে না পায়। আবার যখন নিজ গৃহ থেকে উধাও হয়ে যায় তখন তার জন্য দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু ফেলার কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।"[১]

গ্রীস.

প্রাচীন গ্রীক সমাজের ক্রমবিকাশে নারীর কোন ভূমিকা ছিল না। নারী ছিল তৎকালে এক সমাজচ্যুত জীব। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের ন্যায় কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অন্তরীন রাখা হতো। এমনকি মহান গ্রীস দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মত নারী নামটিও যেন আবদ্ধ রাখা হয়।[২]

মূলত তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ভাবতো। স্বামী বা অন্যান্য পুরুষদের সেবা করবে এটাই তাদের একমাত্র কাজ মনে করা হতো। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা' একথাটি ছিল গ্রীকদের জন্য একান্ত দূর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম-ভালবাসার জন্য তাদের ছিল আলাদা ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে এক সুন্দর চিত্র এঁকেছেন গ্রীক পণ্ডিত ডেমোস্তিন। তিনি বলেন–

"আমরা যৌনতৃপ্তির জন্য বেশ্যালয়ে গমন করি। এবং আমাদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকে বালিকাবন্ধুরাই। আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করি।"

এ জন্যই বিয়ের পর নারীরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে। কিন্তু তা এজন্য নয় যে, সে স্বামীগৃহের কর্ত্রী হবে। বরং স্বামীগৃহে তাকে এজন্যই আসতে হয় যাতে সে সেবিকার দায়িত্ব পালন করে। আর সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

রোম.

রোমান সভ্যতাকে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়ে থাকে। যেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষরাই ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক গুরু। সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিকানা তাদেরই কুক্ষিগত থাকতো। সব ধরনের ক্রয়-বিক্রয়, মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তাদেরই এখতিয়ারাধীন ছিল।

রোমান সমাজে নারীর কোন অধিকার-মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। আইনগত সব ধরনের অধিকার থেকেও তারা ছিল বঞ্চিত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু পাগলের মতো নারীকেও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করাই

১. কিস্সাতুল হামারা, ২৮৩
২. গ্রীক ইতিহাস - ১১৪-১১৭

ছিল তার অযোগ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। পিতার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক কিংবা তার সম্পত্তিতে কোন প্রকার অধিকার ছিল না নারীর। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সকল ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হত। আদালতে বিচার প্রার্থনা কিংবা সাক্ষী দেবারও কোন অধিকার ছিল না একজন রোমান নারীর।

রোমান সামজে অন্য এক ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। যাকে বলা হতো 'সদারী বিবাহ'। এর ফলে যে কোন মহিলা 'সর্দারের স্ত্রী' হিসেবে মর্যাদা পেত। একবার কেউ এই সর্দারী বিয়ের খপ্পরে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যেতে হত। এবং তার উপর কোন অভিযোগ হলে তাকে সর্দারের সম্মুখে পেশ করা হত। যেন সে নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ারও অধিকার রাখতো।

কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হত। তার কোন পুত্রসন্তান না থাকলে বিধবাটি স্বামীর ছোট ভাই কিংবা চাচার অধিকারে চলে যেত।

আরব.

আরবের লোকেরা তাদের গৃহে কন্যা সন্তান জন্মাবার খবরে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো।

এ এক এমন সমাজ যাদের যুদ্ধবিগ্রহই ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম। এ অবস্থায় নারীদের ব্যাপারে তাদের বৈরী মনোভাব ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ যুদ্ধবিগ্রহের ধকল সইবার ক্ষমতা শুধু পুরুষেরই থাকতে পারে। এবং তাদের শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের মাধ্যমেই গোত্রগত আভিজাত্য-মর্যাদা বজায় থাকতে পারে – একথা বলাই বাহুল্য। বাকি রইলো নারী – তারাতো এ ধরনের কোন কাজেই অংশগ্রহণ করতো না। বরং তারা ছিল শত্রুর লক্ষ্যবস্তু। শত্রুরা তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করে তাদের সেবা ও বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করতো। এভাবে মেয়েরা ছিল গোত্রের জন্য এক স্থায়ী বোঝাস্বরূপ। মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল তাদের দুশ্চিন্তার কারণ। কেননা তাদের মেয়ে শত্রুসৈন্যের অধিকারে চলে যাবে– এ ছিল গোত্রের জন্য চরম অবমাননাকর বিষয়।

কোন কোন গোত্রের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাদের কারো ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম হলে তারা এতে তীব্র মর্মযাতনা অনুভব করতো এবং ভাবতো, এমন দুঃখজনক ও লজ্জাকর অবস্থার পরও মেয়েটিকে বাঁচতে দেবে নাকি অপমানের এই মূর্তপ্রতীকটিকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলবে। অনেকেই এই

শেষ সিদ্ধান্তকেই কার্যকরী করতো অর্থাৎ মেয়ে সন্তানটিকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতো। কুরআন পাকে এই নিষ্ঠুর অমানবিক ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।" (সূরা নাহল ঃ ৫৮-৫৯)

আরবে এ প্রথাও ছিল, যখন কারো স্বামী মারা যেত তখন তার বড় ছেলে দাঁড়িয়ে যেত এবং তার পিতার স্ত্রীকে যদি নিজের জন্য প্রয়োজন মনে করতো তবে তার উপর নিজের জামা ছুঁড়ে মারতো। এভাবে সেই বিধবা তার একান্ত মালিকানায় এসে যেত।

## ইহুদীবাদ.

যদিও ইহুদীরা আসমানী কিতাবের অনুসারী কিন্তু তাদের মধ্যেও এক সম্প্রদায় বোনকে তার ভাইয়ের সমান মর্যাদা ও অধিকার দিতে সম্মত ছিল না। ইহুদী সমাজে নারী হচ্ছে নিছক সেবিকার পর্যায়ের একটি শ্রেণী। তাদের ভাইদের মত তারা কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারে কোন অংশ লাভ করতো না। এবং ইহুদী পিতা তার নাবালেগা কিংবা বালেগা প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে বিক্রি করে দেবার অধিকার রাখতো।

## খ্রিস্টধর্ম.

এ ধর্মের বিজ্ঞজনরা একবার নয় বরং দু'বার নারীদের মর্যাদা খর্ব-করণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে। অথচ এ সকল খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ নিজেদের দয়া-মায়া-স্নেহের অগ্রদূত বলে দাবী করতো। তারা নারীদের ব্যাপারে তাদের পবিত্রগ্রন্থ থেকে এভাবে উদ্ধৃতি পেশ করে থাকে ঃ

নারী লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে যাওয়ার জন্য একথাই যথেষ্ট যে, সে নারী। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের অপমানজনক সিদ্ধান্তের কারণও হচ্ছে এই নারী।

নারীদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের ধারণাও ঠিক হিন্দুদের মনুর মত যে, "নারী হচ্ছে নরকের দরজা, পাপের প্রতিমা।"

কোন কোন খ্রিস্টান পণ্ডিত তো আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলছে যে, নারী হচ্ছে শয়তানের সন্তান।

খ্রিস্টান পণ্ডিতদের আরেক গোষ্ঠীর ধারণা হচ্ছে ঃ

নারী হচ্ছে শয়তানেরই বহিঃপ্রকাশ। শয়তান নারীর বেশে দৃশ্যমান হয়ে থাকে।

এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার ছিল খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীদের। তাদের আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত এভাবে যে, "নারী কি পুরুষের মত খোদার ইবাদত করতে পারে?" "নারী কি বেহেশ্‌ত লাভ করবে।" "নারীর মধ্যে কী মানবিক আত্মা আছে? নাকি তারা ভৌতিক জীবন-যাপন করে? ..."[১]

বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজে এই-ই ছিল নারীর অবস্থান। মানবিক অধিকার ও মর্যাদা কোথাও স্বীকৃতি ছিল না।

বস্তুত হিন্দু, ইহুদী, খ্রিস্টধর্ম তথা দুনিয়ার সকল ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল এমন সব অঞ্চল যা সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছিল অগ্রগামী। আর এ সকল এলাকার কর্তৃত্বও ছিল ক্ষমতাধর পুরুষদের হাতে।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষরা এ সকল ধর্মীয় নীতিমালায় হয়ত এমন বিকৃতি সাধন করেছে যার উপর ভিত্তি করে তারা নারীর উপর কর্তৃত্ব ও জুলুম-নিপীড়নের ষ্টীম রোলার চালিয়েছে। নতুবা মহান আল্লাহ তাআলা মানবতার জন্য জুলুম-নিপীড়নমূলক নির্দেশ দিবেন– একথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ আল্লাহ পাক আদল-ইনসাফ আর দয়া-মেহেরবানীর অফুরান আধার চিরন্তন উৎস।

# ইসলামে নারীর মানবাধিকার

"নারী কি পুরুষের মত ইবাদত করতে পারবে?"

"নারী কি পুরুষের মত পরকালীন জীবনে প্রবেশ করবে?" অতীতে এ ধরনের আরো নোংরা ও অর্থহীন বিষয় নিয়ে রীতিমত তর্কবিতর্ক হতো সভ্য সমাজে। অবশ্য একটি ব্যাপার তাদের মতৈক্য ছিল। আর তা হলো, 'নারী হচ্ছে এক অপবিত্র জীব। একে শুধু পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।'

প্রাচীন পৃথিবীর পুরুষ সম্প্রদায়ের যখন এমনই অমানবিক চিন্তাধারা-কার্যকলাপ এক চরম সীমায় পৌঁছে তখনই নারী তথা সমগ্র নির্যাতিত মানবতার চিরমুক্তির পয়গাম নিয়ে দুনিয়ার বুকে অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে

১. المرأة المسلمة

ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটি প্রথমেই নারীজাতির পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করে। পূর্ণ মানবিক অধিকার বহাল করে। এবং এ পর্যায়ে নারীকে এমন এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে যে তাতে অন্যান্যরা তো বটেই স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এমন আদর্শ ও চিন্তাধারা যা নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে হীন ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার পাত্র মনে করে, মানবতার উচ্চতর সোপান থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং পুরুষকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে ইসলাম তাকে জাহেলী মতবাদ বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। ইসলাম তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছে যে, মর্যাদা ও মহত্ত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া-পরহেযগারী। এর ভিত্তিতে নিরুপিত হবে মান-মর্যাদা মহান আল্লাহর দরবারে। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

"যে সৎ কর্ম করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো এবং প্রতিদানে তাদের উত্তম কাজের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করতো।" (সূরা নাহল, ৯৭)

<u>অন্য আয়াতে বলা হয়েছে</u> ঃ

"তারপর তাদের রব তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা পরস্পর এক। তারপর যারা হিযরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করবো এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত নহরসমূহ। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।"

(সূরা আলে ইমরান, ১৯৫)

অর্থাৎ মানবের দু'টি শাখার যেটিই তার সৎকর্মের মাধ্যমে নিজকে আলোর পথে টেনে আনবে, মর্যাদা ও সফলতা হবে তারই ভাগ্যলিপি। তখন জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন কখনোই করা হবে না যে, তুমি মানবের কোন শ্রেণী? পুরুষ নাকি নারী; শ্বেতাঙ্গ না কৃষ্ণকায়, দরিদ্র নাকি বিত্তবান। কিন্তু কেউ যদি অসৎকর্ম করে, তাহলে সে যে-ই হোক না কেন–তার পক্ষে আল্লাহ প্রদত্ত মান-মর্যাদা লাভের আশা না করাই উচিত।

ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে সারা পৃথিবী নারীজাতিকে একটি অকল্যাণকর অপ্রয়োজনীয় শ্রেণী হিসেবে কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাকে অধপতন আর দুঃসহ অপমানের কালকুঠরিতে এমনভাবে শৃংখলিত করেছিল যে, তা থেকে মুক্তি লাভের কোন আশাই ছিল না। দুনিয়ার এই নির্যাতিত মজলুম শ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করে ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিল যে, গতিশীল জীবনের জন্য চাই নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস। এটি তাদের উভয়ের মুখাপেক্ষী নারী সৃষ্টি এজন্য নয় যে, জীবনন্দনের আগাছা পরগাছা ভেবে তাকে উপড়ে ফেলতে হবে। পুরুষ সৃষ্টির পেছনে যেমন আল্লাহ পাকের একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে ঠিক তেমনি নারীকেও তিনি বিশেষ এক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

আসমান জমীনের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান। (সূরা আশ্‌শুরা, ৪৯-৫০)

এক সময় মাজলুম এই শ্রেণীটির বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কুরআন বললো ঃ না, তাদেরও আছে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তারা জীবিত থাকবে এবং যে তাদের এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে তাকে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যা সন্তানদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে ঃ কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। (সূরা তাকবীর ঃ ৮-৯)

বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্যাতিত নারী সমাজের প্রতি সমবেদনা- আর সহমর্মীতা প্রকাশ করে যে নজিরবিহীন বিধি-বিধান আর শিক্ষা দিয়েছেন তা বর্তমানের নারীবাদী সংগঠনসমূহের কারুরই তার চেয়ে উন্নত ন্যায়ানুগ চিন্তাধারা আর বাস্তব কার্যক্রম পেশ করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেছেনঃ

"মাতার অবাধ্যচরণ, পাওনাদারের হক না দেওয়া, সর্বপন্থায় সম্পদ সঞ্চিত করা এবং মেয়ে সন্তানদের জীবিত প্রোথিত করা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"১

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যার কন্যা সন্তান আছে। সে তাকে জীবন্ত কবরস্থ করেনি, বা তাকে অপমানিত করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দেয়নি–আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।২

১. আবু দাউদ
২. আবু দাউদ

আরেক হাদীসে বর্ণিত ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন কন্যা সন্তান প্রতিপালন করবে, তাদের নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেবে, বিয়ে দেবে, আর সুন্দর আচরণ করবে তাদের সাথে, সে লাভ করবে জান্নাত।"[৩]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানের কারণে কোন বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছে এবং সে তাদের প্রতি (তখন) সদাচরণ করেছে তবে সেসব কন্যা সন্তান তার জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে।"[৪]

গোটা বিশ্ব যখন এই নারীকুলকে সকল অপরাধ আর পাপ-পঙ্কিলতার উৎস মনে করছিল তখন পুত-পবিত্র, সত্য-ন্যায়ের উজ্জ্বল প্রতীক, দো-জাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন ঘটলো মাটির ধরায়। তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষা দিলেন তাকওয়া ও খোদাভীতির। তমসাচ্ছন্ন জেহালত অপসারিত করে দ্বীন ও ঈমানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করলেন জগৎবাসীকে।

বস্তুত ইসলামের এসব আদর্শবাণী মানুষের মন ও মননে, চিন্তা ও কর্মে এমন এক নীরব বিপ্লব সাধিত করলো যার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে এমন হলো যে, যারা এককালে জীবিত সন্তান কবরস্থ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতো না। দেখা যেত না ললাটে এক ফোটা ঘাম এসব অমানবিক কর্মকাণ্ডের মুহূর্তে। শেষপর্যন্ত তারাই সেসব সন্তানের লালন-পালন আর তত্ত্বাবধানকে নিজেদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি ভাবতে লাগলো, আখেরাতের অমূল্য পাথেয় হিসাবে সমাদৃত হতে লাগলো। কালক্রমে এমন হলো, আপন শিশু যাদের ক্রোড়ে নিরাপত্তা আর শান্তি-সুখের পরশ বঞ্চিত ছিল তারাই হয়ে গেল অন্যজনের সন্তানের প্রতিপালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক।

চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যাপক পরিবর্তন,ইতিহাসের কোন পর্বে এর দৃষ্টান্ত মিলতে পারে?[৫]

৩. আবু দাউদ

৪. বোখারী শরীফ, কিতাবুল আদব।

৫. عورت اسلامی معاشرہ میں

# নারীর ধর্মীয় মর্যাদা

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, নারীর ধর্মীয় মর্যাদার ব্যাপারটি তাকে তাকওয়া-খোদাভীরুতার উপদেশ দানের মধ্যে নিহিত। কারণ বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে তার দায়িত্ব ঠিক পুরুষের মতই গণ্য করা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে তাকে পুরুষের মতই যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করা হয়েছে। আর তাইতো আল্লাহ যখন আদি মানব হযরত আদমকে (আঃ) বেহেশ্‌তে থাকার জন্য বলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে বারণ করেন তখন সেই আদেশ ও নিষেধের সম্বোধন আদি মাতা হযরত হাওয়ার (আঃ) প্রতিও আরোপ করা হয়েছিল যেমনটি হয়েছিল হযরত আদমের (আঃ) প্রতি। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

"হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে বসবাস কর। সেখানে তোমাদের যা মনে চায় তা খাও। কিন্তু এই গাছের কাছে যেওনা। তাহলে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সুরা আরাফ-১৯)

তারপর আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে, নাফরমানি ও অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার-ভৎর্সনা করেন তখনও তাদের উভয়কে একই সাথে সম্বোধন করে বলেনঃ

"আমি তোমাদের উভয়কে ঐ গাছের নিকট যেতে বারণ করিনি?"

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে তাদের দায়িত্বের প্রেক্ষিতে পরকালে একইভাবে জবাবদিহি করতে হবে এবং তারা উভয় সৎকর্ম ও অসৎকর্মের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার অর্জন করবে। ঐ প্রসঙ্গে কুরআন পাকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"আর যে সৎ কর্ম করবে তা সে পুরুষ কিংবা নারী–যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এমন মানুষই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের অনুপরিমাণও অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারবে না। (সূরা নেসা ঃ ১২৪)

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

মোনাফেক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। তাদের জন্য সেটাই উপযুক্ত স্থান। তাদের উপর আল্লাহর লানত রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। (সূরা তাওবাঃ ৬৮)

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ওলামায়ে ইসলাম এমন অনেক মহিয়সী বিদূষী নারীদের উল্লেখ করেছেন যারা বেলায়েতের স্তরে পৌছে গিয়েছিলেন, ইবাদত ও

সাধনার মাধ্যমে কামেল হয়েছিলেন। এছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার যোগ্যতা কোন পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে? এ ব্যাপারে অনেক আলেমের মত হচ্ছে, নারী নবী হতে পারে তবে রাসূল নয়। আর নবী তাঁকেই বলা যেতে পারে যিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক সম্বোধিত হন। এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করা হয়। পক্ষান্তরে রাসূল বলা হয় তাঁকেই যিনি নব শরীয়ত নিয়ে আগমন করেন। আল্লাহর বান্দাদের ধর্মীয় ও আধ্যাতিক শিক্ষা দান করেন। নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাদানের দায়িত্ব আরোপ না করা হলেও তার নবুওতের যোগ্যতা বহাল আছে। এ কারণেই অনেকের মতে হযরত মারিয়াম (আঃ) নবী। ফেরেশতা কর্তৃক সম্বোধিত। অনুরূপভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মাতাও নবী ছিলেন। এবং ফেরআউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (আঃ) যিনি শুরু থেকেই ছিলেন মুসলিম, তিনিও উন্নীত হয়েছিলেন নবুওতের পর্যায়ে।

প্রকৃতপক্ষে নবুওত হচ্ছে মানবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। আল্লাহ তাআলার মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পর যদি কোন শ্রেষ্ঠত্বের স্তর-মর্যাদার কল্পনা করা যায় তবে তা একমাত্র নবুওতের স্তর হতে পারে। এর চাইতে উর্ধ্বে কোন পর্যায়ের হতে পারে না।

সুতরাং নারীর পক্ষে যদি নবুওতের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয় তবে এ থেকেই তার সর্বোচ্চ মর্যাদা-যোগ্যতার সম্যক পরিচয় মিলে। এবং এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সে তার আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে নৈকট্যের সকল স্তর অতিক্রম করে যেতে পারে। তবে রাসূল হতে পারে না কোন নারী। কারণ রাসূলের অর্থ হচ্ছে, যিনি শরিয়তের সাথে শিক্ষা, দিক-নির্দেশনা দান করেন। আর মেয়েদের এই স্তরে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এতে ভিন পুরুষকে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে রয়েছে ফিতনার আশঙ্কা। তাই এ স্তর থেকে নারীদের পৃথক রাখা হয়েছে।

মোটকথা, যদি মেয়েরা একনিষ্ঠভাবে সাধনা করে তবে এমন কোন বিদ্যা-মর্যাদা নেই যা তাদের অর্জন করা কষ্টকর হতে পারে। ইমাম তাহাবীর (রহঃ) কন্যা, হযরত রাবেয়া বসরী, হযরত রাবেয়া আদাবিয়া, প্রায় লাখো সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ, তাবেয়ীনদের স্ত্রী-কন্যাগণ– এঁরা সকলেই ছিলেন বড় আলেমা বিদূষী। মুসলিম উম্মাহের আদর্শস্থানীয়া রমণীকুল।[1]

১. খোতবাতে হাকীমুল ইসলাম ঃ ৪র্থ খণ্ড

# নারীর উত্তরাধিকার

**পটভূমি ঃ** প্রাচীনকালে নারীর পক্ষে মৃতের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের কোন কল্পনাই মানুষ করতে সক্ষম হতো না। এ ছাড়া কোন ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তুতেও তাদের কোন মালিকানা স্বীকৃত ছিল না। এ ক্ষেত্রে বরং খোদ নারীকেই পরিণত করা হয়েছিল ক্রয়-বিক্রয় সামগ্রীতে।

ক্রয়-বিক্রয়ের এ ধারা প্রায় একাদশ শতক পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছিল প্রচলিত। অর্থাৎ ইসলাম আগমনের ছ'শো বছর পরও মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এ জঘন্য প্রথার ব্যাপক বিস্তৃতি।

ইসলাম আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর পেরিয়ে যাবার পর ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে প্রথমবারের মত একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এতে কয়েকটি বিশেষ বস্তুর উপর নারীর মালিকানা স্বীকৃত হয়।

বস্তুত এ থেকেই ইসলামের মাহাত্ম্য ও যুগান্তকারী ভূমিকার কথা ভেবে আমরা বিস্মিত হই। ইসলাম যেখানে পনেরশো বছর পূর্বে নারীজাতির পূর্ণ অধিকার, মালিকানা ও উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে ইসলামের এক হাজার বছর পর নাম মাত্র অধিকার দেওয়া হল পাশ্চাত্যের নারী সমাজকে এবং তাও অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে।

এ কথা সুবিদিত যে, এক সময় আরবে নারীদেরকে উত্তরাধিকার অর্জনের যোগ্যই মনে করা হতো না। ভাবা হতো, নারী দুর্বল। ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনে ঝড়ের গতিতে অগ্রসর হওয়ার শক্তি তার নেই। শত্রুর সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সেই অমিত তেজ-বিক্রম তার কোমলাঙ্গে অনুপস্থিত। যুদ্ধে বিজয়লব্ধ ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করতেও সে ছিল অক্ষম। এ সকল কারণেই তারা নারীকে মিরাস-উত্তরাধিকার বঞ্চিত করে রাখে। এক্ষেত্রে কেবল তারা পুরুষদেরকেই উত্তরাধিকার লাভের যোগ্য মনে করতো। যারা ছিল যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে শত্রুর দাঁত ভাঙা জবাব দিতে সক্ষম।

বলা বাহুল্য, অন্ধকার যুগের আরব সমাজে উত্তরাধিকার পাওয়ার সর্বাধিক যোগ্য মনে করা হতো বড় ছেলেকে। তারপর ক্রমানুযায়ী অন্যান্য পুত্র সন্তানদের মধ্যে এটি বন্টন করা হতো। কিন্তু এমন ছেলে যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে সক্ষম নয় তাকে উত্তরাধিকার দেওয়া হতো না। এমনকি কেউ মৃত্যুকালে যদি শুধু কন্যাসন্তানই রেখে যেত, তবে তার উত্তরাধিকার স্বত্ব হতে তারা হতো বঞ্চিত। সবকিছু চাচাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হতো।

## সর্বপ্রথম ইসলামই নারী উত্তরাধিকার প্রর্বতন করে

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে জাহেলী যুগের যাবতীয় অন্যায়-অবিচার আর শোষণ-বঞ্চনার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায় মানুষ। এবং নারীজাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওহুদ যুদ্ধের পর হযরত সাআদ বিন রবীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সাআদ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি তার দু'জন বিবাহযোগ্য কন্যা রেখে গেছেন। তার শাহাদাতরে পর তাঁর চাচা সব সম্পতি দখল করেছে। এখন ওদের বিয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যার সমাধান সম্পদ ছাড়া সম্ভব নয়।"

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর।" তারপরই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত এ আয়াত নাযেল হয়ঃ

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন ঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর.অধিক, তবে তাদের জন্য সেই সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে সে মারা যায়। এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর মৃতের যদি কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগে এক ভাগ অসিয়তের পর, যা সে করে মারা গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির যা তারা ছেড়ে যায় অসিয়তের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের তাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক-তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে অসিয়তের পর যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সহনশীল।" (সূরা নিসা ঃ ১১-১২)

উল্লেখ্য, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দু'টি মেয়ের চাচাকে ডেকে বললেন ঃ "সাআদের উভয় মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাকে অষ্টামাংশ, তারপর অবশিষ্ট যা থাকবে তা হবে তোমার।"

মানব ইতিহাসে নারীর উত্তরাধিকার লাভের এটাই প্রথম নজির। তাদের এই ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভের পেছনে ইসলামের এই অসামান্য অভূতপূর্ব অবদানের কথা মুসলিম অমুসলিম তথা পৃথিবীর সকল ধর্ম বর্ণের মানুষই যে একবাক্যে স্বীকার করবেন তাতে আর সন্দেহের কি থাকতে পারব।

ইসলামের এই অবিস্মরণীয় সাফল্যের পশ্চাতে যেমন রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগ্রাম-সাধনা, তেমনি নারীমুক্তি অর্জনের এই নব আদর্শের বাস্তবায়নে তৎকালীণ পুরুষশাসিত গোটা সমাজ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। পরস্পর তারা নানা রকম কথাবার্তা বলতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, "কি আশ্চর্য কথা! এখন স্ত্রীগণ চতুর্থাংশ পাবে, মেয়েদেরকে অর্ধেকাংশ দিতে হবে আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকেও মৃতের ত্যাজ্য সম্পতি থেকে অংশ দিতে হবে? অথচ তারা কেউ যুদ্ধ করে না, যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদও কুড়িয়ে আনে না।?

এরপর তারা নিজেরাই নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতে থাকেঃ "যাক, এসব কথা এখন চুপচাপ শুনে যাও। এক সময় হয়ত এসব কথা বিস্মৃতির অতল আঁধারে হারিয়ে যাবে। নতুবা এ ধরনের আইন-আদেশ পরিবর্তিত হয়ে যবে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব সার্বজনীন কালোত্তীর্ণ বিধি-বিধান ও আদর্শ কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া কিংবা বিস্মৃতিরযোগ্য ছিল না কখনোই। এ ছিল চিরন্তন, সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য সমান হিতকর। কেয়ামত পর্যন্ত এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়।

বলা বাহুল্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের অধিকার দানের কথা যেমন ভুললেন না তেমনি নারীদের অধিকার সংক্রান্ত বিধি-বিধানেও কোন রকম সংশোধন করেননি বরং বরাবর তিনি এসকল আইন-আদেশ কার্যকরী করেন। অনুপ্রাণিত করেন সকল মানুষকে তা যথাযথভাবে পালন করবার জন্য।

আজও নারীদের অধিকার সংক্রান্ত ইসলামী আইন ও আদেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে কার্যকরী হচ্ছে। যুগ ও পরিবেশ বদলেছে সত্যি, কিন্তু কোন যুগে কোন পরিবেশে তা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি কখনো। ইসলাম যে সকল শ্রেণী

ও বর্ণের মানুষের জন্য স্বাভাবিক ও চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা এটা তারই অন্যতম বাস্তব দৃষ্টান্ত।

বস্তুত আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটান তা সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্যই অশেষ কল্যাণকর অপরিবর্তনীয় জীবন ব্যবস্থা। এ কোন মানব মস্তিষ্ক প্রসূত স্বভাববিরুদ্ধ চিন্তাধারা নয়। এ হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের স্রষ্টারই দেওয়া অতুলনীয় জীবন ব্যবস্থা।

## নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য

মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি হচ্ছে এই আয়াতঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

"পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত অংশে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত অংশে নারীদেরও অংশ আছে অল্প হোক কিংবা বেশি। (সূরা নিসা ঃ ৭)

কিন্তু স্মর্তব্য যে, নারীর অংশ ওয়ারিশদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। আর তা মৃতের সাথে তার নৈকট্য ও দূরত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এভাবে বিভিন্ন নিকটাত্মীয়দের সাথে তার মানও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। নিম্নে তার বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

(১) ক. ত্যাজ্য সম্পত্তিতে বোন ভাইয়ের অর্ধেকাংশ পাবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।" (সূরা নিসা ঃ ১১)

খ. কিন্তু ওয়ারিশদের মধ্যে যদি কোন ভাই না থাকে এবং মেয়ে একজন হয় তবে সে পুরো সম্পত্তির অর্ধেকাংশ পাবে। যেমন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

"যদি মেয়ে একজন হয় তাহলে ত্যক্ত সম্পতির অর্ধেক অংশ পাবে।"

(সূরা নিসা ঃ ১১)

গ. আর যদি মেয়ে একাধিক হয় তাহলে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যেমন এ সম্পর্কে আয়াতটি হচ্ছেঃ

"যদি মেয়ে দুই-এর বেশি হয় তাহলে তারা ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।" (সূরা নিসা ঃ ১১)

২. ক. মায়ের উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে ঃ

"যদি মৃত ব্যক্তি সন্তান রেখে যায় তবে তার মাতাপিতা তার সম্পতির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে।"

খ. "কিন্তু যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে মা মোট সম্পতির এক তৃতীয়াংশ পাবে।"

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না থাকে তাহলে তার মা পুরো সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং পিতা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে।

গ. "যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে কিন্তু ভাই বর্তমান থাকে তাহলে মা ষষ্ঠাংশ পাবে।"

অর্থাৎ নিঃসন্তান মৃত ব্যক্তির যদি ভাই বর্তমান থাকে তবে মায়ের অংশ এক তৃতীয়াংশ থেকে কমে ষষ্ঠাংশ হয়ে যাবে।

৩. স্ত্রীর উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

"এবং তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ত্যক্ত সম্পতি থেকে এক চতুর্থাংশের অধিকারিণী হবে যদি তোমরা নিঃসন্তান হয়ে থাক। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তাদের জন্য হবে অষ্টমাংশ। তবে তা ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর।" (সূরা নিসা ঃ ১২)

অর্থাৎ যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার পর স্ত্রী অষ্টমাংশ পাবে।[১]

## পুরুষের তুলনায় নারীর অর্ধেক অংশ

আপাতঃদৃষ্টিতে এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক যে, পুরুষের তুলনায় নারীর অংশ অর্ধেক করে ইসলামী শরীয়ত সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি অতিব তাৎপর্যপূর্ণ। কিছুটা অভিনিবেশের দাবী রাখে। গোটা ব্যবস্থাটা সম্পর্কে যাদের পড়াশুনা ও ধারণা পূর্ণাঙ্গ নয় শুধু তারাই এ ধরনের চপল উক্তি করে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

১. المرأة : فی ضوء الاسلام طبع فی مصر

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পুরুষকেই পরিবার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবার-পরিজনের প্রতিপালন ও তাদের ভালমন্দ সবকিছু দেখাশুনা পুরুষই করে থাকে। নারীকে এ কঠিন দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া পুরুষকে নারীর মোহর দান ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। বোনদের বিয়ে-শাদী এবং উপহার-উপঢৌকন পাঠাতে হয়। বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান প্রদানের ভারও থাকে পুরুষের। পক্ষান্তরে বোনের এ ধরনের কোন দায়িত্বই নেই। এছাড়া বোন তার বিয়ের পর স্বামীপ্রদত্ত মোহরও পায় এবং স্বামীর সম্পত্তিতেও তার নির্ধারিত অংশ থাকে। অন্যদিকে ভাই কেবল একদিকেই অংশ পায়। সন্তানাদির জন্মের পর পুরুষের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। যেমন তাদের লালন-পালন, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। অথচ এসব ক্ষেত্রে নারীকে কোন দায়িত্ব পালন করতে হয় না।

সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়দায়িত্ব কেবল ভাই তথা পুরুষকেই পালন করতে হয়। সুতরাং এ গুরুদায়িত্বের প্রেক্ষিতে পুরুষ যদি নারীর দ্বিগুণ অংশ পেয়ে থাকে তাহলে যে তা অন্যায়-জুলুম হবে না– একথা নিশ্চিত বলা যায়। তাই এ কথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের জন্য অর্ধেক বেশি বরাদ্দ করে ইসলাম অত্যন্ত বাস্তব ও ইনসাফভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা করেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আধুনিক যুগে যখন নারীও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ-কর্ম করছে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছে, আর উপার্জন করে ব্যয়ভার নির্বাহে সহযোগতিা করছে, তাহলে এখনও কি তারা পুরুষের অর্ধেক অংশ পাবে? যুগের পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করে নারী-পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার স্বত্ব বন্টনে সমতা অনিয়ম করা উচিত নয় কি?

এ ধরনের প্রশ্ন বাহ্যতঃ বেশ জোরালো যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও বাস্তবতার নিরিখে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ নারী আয়-উপার্জন করলেও দায়-দায়িত্ব ঠিক পূর্বের মত এখনো পুরুষকেই পালন করতে হয়। নারী পূর্বের মত এখনো পিতৃগৃহ ও স্বামীগৃহ হতে সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। মোহরানা ও উপহারাদি পেয়ে থাকে এবং বর্তমানে সে যে আয়-উপার্জন করে থাকে তাও সম্পূর্ণরূপে তারই এখতিয়ারে থাকে। তার এই অর্জিত সম্পদ সে কাউকে দিতে বা সে কোন রকমের দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়। অথচ অতীতের মত পুরুষ আজো সবরকমের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলছে? মূলত যুগ পাল্টালেও আসল অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং ইসলাম যে নীতি-বিধি প্রবর্তন করেছে তা এখনো তেমনি কার্যকর থাকা জরুরী।

বস্তুত গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর দায়ভার পুরুষদের উপরই ন্যস্ত, নারী এ থেকে পরিপূর্ণভাবেই মুক্ত। বিয়ের পূর্বে মেয়েরা অভিভাবকের এবং বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে ভরণ-পোষণ-বাসস্থান লাভ করে থাকে। এরূপ অবস্থায় নারীকে উত্তরাধিকার স্বত্বে পুরুষের সমকক্ষতা দান কিছুতেই সুবিচার হতো না। এ হতো নিতান্তই অবিচারের নামান্তর। আর ইসলামী সমাজব্যবস্থা সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[১]

## নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র

নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র কি? সমাজে তার ভূমিকা কি? তার চেষ্টা-শ্রম কোন্ পথে অগ্রসর হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে কুরআনে কারীম স্পষ্টভাবে এর জবাব দিচ্ছে ঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى -

"তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। জাহেলি যুগের মেয়েদের মত রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

আয়াতে জাহেলী যুগ বলে প্রাক ইসলামী অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে– যা ছিল বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত। এতে নারীদের গৃহে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। অতএব নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া তো নিষিদ্ধ। কিন্তু সাথে সাথে এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিত্রে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়। তাছাড়া এই সূরার পরবর্তীতে উল্লেখিত يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ ..... الخ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।[২]

এক হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠ হচ্ছে নারীর জন্য উত্তম মসজিদ।"[৩]

একবার হযরত আবু হুমাইদ সায়েদীর (রাঃ) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমি আপনার সাথে মসজিদে নামায পড়তে চাই এতে আপনার কি রায়? তিনি বললেনঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি সত্যিই তা চাও। তবে জেনে রেখ,

১. المرأة في ضوء الاسلام

২. মাআরেফুল কোরআন ঃ মুফতী শফী (রহঃ)

৩. মুসনাদে আহমাদ

তোমার গৃহের কোন ক্ষুদ্র কামরায় নামায পড়া প্রশস্ত কামরায় নামায পড়ার চাইতে উত্তম। কামরায় পড়া বাড়ির মধ্যে পড়ার চাইতে উত্তম এবং মহল্লার মসজিদের চেয়ে বাড়িতে অবস্থান করো পড়া উত্তম। এভাবে তোমার বস্তির মসজিদে পড়া নামায আমার মসজিদে পড়া নামাযের চাইতে উত্তম।

এ হাদিসের রাবী বলেনঃ আবু হুমাইদের স্ত্রীর উপর নবীজীর বাণীর এমনই প্রভাব পড়েছিল যে, পরবর্তীতে তিনি গৃহকোণকেই তার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন এবং সারা জীবন সেখানেই নামায আদায় করে কাটিয়েছেন।[১]

বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সামষ্টিক ইবাদতে যোগদানের চাইতে নিজের কর্মক্ষেত্রে তৎপর থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোন সামষ্টিক কার্যক্রম থেকে নারীর পেছনে থাকা ততটা ক্ষতিকর নয় যতটা তার কর্মক্ষেত্র পরিত্যগের কারণে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। আসলে সামষ্টিক ইবাদতের কল্যাণের কোন বিকল্প নেই এমন তো নয়। বরং বিভিন্নভাবে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব। কিন্তু নারী তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করার দরুন সমাজ ও পরিবারে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা কোনভাবেই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই ইবাদত কিংবা অন্য কোন দায়িত্ব-কর্তব্য সমষ্টিকভাবে তা পালনের কোন তাগিদই করা হয়নি নারীর প্রতি। তাকে বরং গৃহের নিভৃত কোণে কোন একটি স্থানে নামায পড়ার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে নারীর প্রকৃত মান-মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য তাকে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অন্যের জন্য তো দূরে থাক শুধু নিজের অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বও তার ঘাড়ে শুধু এজন্য চাপিয়ে দেওয়া হয়নি যাতে তার কোন অবস্থাতেই বাড়ির চৌহদ্দি ডিঙাতে না হয়।

তবে যদি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েও থাকে কিংবা কোন ইবাদত সমষ্টিগতভাবে আদায়ের অনুমোদন করা হয়ে থাকে, তাহলে সাথে সাথে এমন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রতিটি মুহূর্তে তার অনুভূতিকে সজাগ করে যে, যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে সেটিই তার প্রকৃত ক্ষেত্র। গৃহ থেকে বের হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে নারীত্বের সীমারেখা লঙ্ঘন করে অগ্রসর হতে থাকবে।

যেমন নারীদেরকে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই শর্তে যে, তারা পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করবে না। পুরুষোচিত ভাব-আচরণ প্রকাশ করবে না। বরং তাদের কাতার হবে

১. মুসনাদে আহমাদ

পুরুষের কাতার থেকে পৃথক। এই পার্থক্য ও দূরত্ব যত বেশি হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা তত বেশি পছন্দনীয়।

মোটকথা, সামগ্রিক বিচেনায় এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম নারীকে কখনোই তার নিজস্ব ক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে যোগদানের অনুমতি দেয় না। বরং তাকে সমাজের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা থেকে মুক্ত করে শুধু একটি ক্ষেত্রেই তৎপর রাখতে চায় যার দায়িত্ব তার প্রতি অর্পণ করা হয়েছে।

## মেয়েদের চাকুরী

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে মহিলাদের চাকুরির ব্যাপারটি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। আমরা এখানে বাস্তব নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের চাকুরী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাই এবং সাথে সাথে এ কথা বলে দিতে চাই যে, পাশ্চাত্যে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া কি দেখা দিয়েছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আজ নানারকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ (UNO) পুরুষ ও নারীদের একই কাজের জন্য সমঅংশের বেতন বরাদ্দকরণে ব্যর্থ হয়েছে। খোদ ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরাই নারী পুরুষের পারিশ্রমিক বা বেতনের সমতার ঘোর বিরোধী। তারা নারী পুরুষের সমবেতনের ফলে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হবে বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

আজ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং আইনবিদরা সর্বসম্মতভাবে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে, নারী শুধু সেই কাজের জন্যই উপযুক্ত যা তার স্বভাব ও মানসিকতার অনুকুল। নারী পুরুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক ব্যবধান রয়েছে তার সীমালঙ্গন করা হচ্ছে বলেই আজকের সমাজ অবনতির চরম পর্যায়ে এসে পৌছেছে এবং নৈতিক ,চারিত্রিক মূল্যবোধের অভাব ঘটেছে। আজ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মত এমনকি পাশ্চাত্যের অনুকরণে মুসলিম দেশগুলোতেও পাশ্চাত্যের এই বস্তাপচা পরিত্যাক্ত সমাজ ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করা হচ্ছে। বাস্তবায়িত করা হচ্ছে নতুন সমাজ কাঠামো। ফলে এসব দেশগুলোতেও সেসব কুৎসিত সামাজিক ব্যাধি দেখা যেতে শুরু করেছে। এর বিষবাষ্প পরিবেশ-সমাজকে ছেয়ে ফেলছে। যার যন্ত্রণায় গোটা পাশ্চাত্য সমাজ ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার তুলছে। আমাদের সমাজেও যদি পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণ অব্যাহত থাকে তবে তাদের মত আমরাও যে নানা কঠিন সমস্যায় জড়িয়ে পড়বো–তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আসলে নারীর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে চাকুরীতে যোগদানের পেছনে যে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই–তা নয়। নারীমুক্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রথমতঃ চাকুরী তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের চিন্তা-মানসিকতার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু নারী জনগোষ্ঠীর অর্ধেকাংশ, তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুষের পাশাপাশি জীবনসংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তৃতীয়তঃ নিজের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। এমনও হতে পারে যে, সে বিধবা এবং ছোট ছেলেমেয়েদের লালন-পালনের দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়। এ ক্ষেত্রেও নিজের এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্যে তাকে চাকুরীর আশ্রয় নিতে হয়। ফলে তার নিজস্ব আয়ের একটা সংস্থান হয়। যা দিয়ে নিজের চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়। এতে সে কারো করুণার পাত্রী না হয়ে নিজ আত্মমর্যাদা রক্ষার তাগিদে উপার্জনের পথ বেছে নিতে পারে।

নারীদের চাকুরীতে যোগদানের এই হল যুক্তি। এসব যুক্তির বৈধতা সম্পর্কে সব রকমের বৈষম্য বা পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ বাস্তব ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা জরুরী।

নারীদের চাকুরী সংক্রান্ত এ সকল যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলাম নারীর চেষ্টা-সাধনা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমিত রাখেনি বরং তার কর্মতৎপরতা ও সম্ভাবনার বিরাট ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাকে তার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ সাধন করতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। তাই সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অগ্রসর হতে পারে তেমনি কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতির অধিকার রাখে। জীবিকার জন্য বিভিন্ন কাজ-কারবার, শিল্প-কারখানা স্থাপন বা পরিচালন এবং তাতে কাজ করবারও অধিকার রয়েছে নারীদের। সাথে সাথে জাতি ও সমাজের বিভিন্ন সামষ্টিক কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি আছে তাদের জন্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে জরুরীভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্তই জরুরী। আসলে অনুমতি এক কথা আর তার বাস্তব চর্চা একান্তই প্রয়োজনীয় ও জরুরী হওয়া একেবারেই ভিন্ন কথা। নারীরা নিজেদেরকে এসব কাজে সঁপে দিক– ইসলাম তা মোটেই কামনা করে না। এ ধরনের কাজে নারীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলাম তার এই উচ্ছ্বাস-আগ্রহ নির্মূল করতে চেষ্টা করেনি। বরং তার বাস্তবায়নের অনুমতিটুকু শুধু দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়লে নারী এই অনুমতির প্রেক্ষাপটে সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারে।

হযরত ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমার খালাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিল। (তালাকের ইদ্দতের সময় তার ঘরে বসেই কাটানো উচিত ছিল। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে তিনি নিজের বাগানের কয়েক ছড়া খেজুর কাটার (এবং তা বিক্রি করার) ইচ্ছা করলে এক ব্যক্তি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলো এই বলে যে, এ সময় ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নয়।) বিষয়টির সুরাহার জন্য তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে তিনি বললেনঃ

"বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট। (এবং বিক্রি কর) হয়ত এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দান-খয়রাত করতে বা কোন কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে পার।[১]

এ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবেরের (রাঃ) খালাকে মনবতার কল্যাণকামিতা ও তার উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। অর্থাৎ ইসলামী জীবনবিধান নারীকে এমন যোগ্য দেখতে চায় যাতে সে নিজের মত অন্যেরও সেবা করতে পারে এবং তার হাতে কল্যাণকর কাজ সম্পাদিত হয়।

এ হাদিসে আরো একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে।

আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন ও কল্যাণময় কাজের পরিপূর্ণতার জন্য নারী ঘর থেকে বাইরে যেতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীরা প্রয়োজনে বাজার ও ক্ষেত-খামারে যাতায়াত করতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ হযরত সাওদাকে (রাঃ) বাইরে যেতে দেখে হযরত ওমর (রাঃ) তার সমালোচনা করলে তিনি (কোন কথা না বলে) ঘরে ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি বললেন। এর পরই তাঁর প্রতি অহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেল। এ অবস্থা দুরীভূত হওয়ার পর তিনি বললেনঃ

"প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।"[২]

"হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা হযরত আসমা (রাঃ) তার সাংসারিক জীবনের প্রথম দিককার অবস্থা বর্ণনা করে বলেনঃ হযরত জুবায়ের (রাঃ)-এর সাথে আমার সবেমাত্র বিবাহ হয়েছে । তাঁর শুধু সম্পদ বলতে একটি পানি বহনকারী উট ও একটি ঘোড়া ছিল। কাজের লোক বা অন্য কোন জিনিস ছিল না। আমি নিজেই তার ঘোড়ার ঘাস-পানির ব্যবস্থা করতাম এবং পানির পাত্র

১. আবু দাউদ শরীফ
২. বোখারী শরীফ

পূর্ণ করতাম। আমি ভাল করে রুটি তৈরি করতে পারতাম না। কিছু সংখ্যক আনসারী ছিল আমার প্রতিবেশী। তারা আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ বান্ধবী। তারাই আমাকে রুটি তৈরি করে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুবায়েরকে (রাঃ) আমার বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে একখণ্ড জমি চাষ করে তার ফসল গ্রহণ করতে দিয়েছিলেন। আমি সেই জমি থেকে খেজুরের আঁটি সংগ্রহ করে আনতাম। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি ভর্তি এক ঝুড়ি বহন করে আনছিলাম, রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা হয়ে গেল। তার সাথে যেহেতু কয়েকজন আনসার ছিলেন, তাই পুরুষদের সাথে পথ চলতে আমি লজ্জা বোধ করলাম। সাথে সাথে হযরত জুবায়েরের কথাও মনে পড়ে গেল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্নবোধ মানুষ, তিনিও তা পছন্দ করবে না। সুতরাং আমি ইতস্তত করছি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বুঝে ফেললেন এবং আমাকে না নিয়েই চলে গেলেন।[১]

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী শিল্প-কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি তার নিজের, স্বামী ও সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একবার তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেনঃ

আমি কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ এক নারী। বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে বিক্রয় করি (এভাবে আমি আয়-উপার্জন করতে পারি, কিন্তু) আমার স্বামী-সন্তানদের (আয়ের কোন উৎস) কিছুই নেই।

তিনি জানতে চাইলেন, তিনি কি তাদের জন্য ব্যয় করতে পারেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ তুমি তাদের জন্য ব্যয় করতে পার। এজন্য তুমি পুরস্কৃত হবে।[২]

এসব হাদিস থেকে একথাই বোঝা যাচ্ছে যে, নারীর বাস্তব কর্মতৎপরতা তথা ঘরকন্নার কাজ ছাড়াও সে ঘরের ভিতরে ও বাইরে আরো অনেক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে পারবে। ইসলাম তার এ সব কর্মতৎপরতার পথে কখনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে নারী সমাজের যে খেদমতই করুক না কেন তাকে কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। এগুলো বাদ দিয়ে সে কোন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, আত্মনির্ভরশীলতা ও উন্নতি সর্বোপরি

১. বোখারী শরীফ

২. তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৮ম খণ্ড

সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি তথা জাতীয় উন্নয়নের ব্যাপারটিও এ সকল নীতিমালার সাথে জড়িত।

## ১. বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি

প্রথম নীতি হচ্ছে, তকে সর্বাবস্থায় নিজের বাস্তব অবস্থার প্রতি নজর দিতে হবে যে, মূলত সেই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের মূল এবং এর ভালমন্দের জন্যে দায়ী। অতএব তার প্রকৃত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কোন কাজ না তাকে রাষ্ট্র করিয়ে নিতে পারে না তার এমন কোন অধিকার আছে যে সে তার গৃহের জগৎকে ধ্বংস ও বিরাণ করে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণে নিয়োজিত হবে। যদি সে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের কারণে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির গিঁট খুলতে না পারে, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষনীয় নয়। কিন্তু নিজের দায়িত্ব পেছনে রেখে জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে কর্মতৎপরতা দেখানো তার জন্য গোনাহের কাজ বলে বিবেচিত হবে। যদি তার সমস্ত শক্তি-মেধা এমন হাত-বাহু এবং এমন মন-মগজ তৈরিতে ব্যয় করে যার মধ্যে জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সংকল্প-সাহস বিদ্যমান যা যথার্থই জাতির নির্মাতা কল্যাণকামী, তবে এটাই হবে তার উজ্জ্বল সফলতার স্বণার্ভ সোপান। যদিও এ ক্ষেত্রে তার বাহুবল যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে ব্যয়িত না হয়। তার পদযুগল দেশ-জাতির কল্যাণে ধুলি-ধুসরিত না হয়।

## ২. স্বামীর আনুগত্য

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত রূপরেখা আছে। এতে পুরুষকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ব্যবস্থাপক হিসেবে। অর্থাৎ সে নারীর উপর হুকুম চালানোর ও কর্তৃত্ব করার অধিকার রাখে। কুরআন মজিদের ঘোষণা ঃ

"পুরুষ নারীদের জন্য ব্যবস্থাপক।" (সূরা নিসা)

সুতরাং দাম্পত্য জীবনের সাফল্যের জন্য পুরুষ তার স্ত্রীকে যে সীমা ও আইনের অধীন করতে চাইবে তা তার এখতিয়ারে আছে। এবং তার এই অধিকার আইন যতক্ষণ শরীয়ত তথা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক না হবে ততক্ষণ তার আনুগত্য করা নারীর জন্য জরুরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহকে ভয় করে চলার পর একজন ঈমানদারের জন্য নেক্কার স্ত্রী পৃথিবীর সবচাইতে বড় নেয়ামত ও কল্যাণ। নেক্কার স্ত্রীর গুণ তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"সে নির্দেশ দিলে তা পালন করে'।

একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো নেক্কার স্ত্রীর গুণাবলী সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেনঃ

"স্বামী তাকে দেখলে খুশী হয়। আদেশ দিলে পালন করে এবং নিজের ও সম্পদের ব্যাপারে এমন ব্যবহার দ্বারা তার বিরোধীতা করে না যা সে অপছন্দ করে।"

আরেক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর অবস্থান ও মর্যাদা অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন ঃ

"যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য স্বামীর গৃহে এমন কোন লোককে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া জায়েয নয় যাকে সে (স্বামী) অপছন্দ করে। আর সে অপছন্দ করলে বাড়ির বাইরে যাওয়া জায়েয নয়। স্বামীর ব্যাপারে অন্য কারো আনুগত্য না করা। তার আগমনে কর্কশ না হওয়া এবং তাকে মারপিট না করা।"

তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র আছে যেখানে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিতে বাধ্য নয়। যেমন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের কথা হানাফী ফকিহগণ উল্লেখ করেছেনঃ

"ফিকাহবিদগণ বলেনঃ বিশেষ কিছু কারণ ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই নারীদের তার স্বামীদের অনুমতি ছাড়া গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। এসব কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, নারী যদি এমন কোন গৃহে অবস্থান করে যা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তার যদি কোন মাসআলা জানার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার স্বামী যদি ফকীহ না হয় তবে তা জানার জন্য সে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই মজলিসে ইলমে যেতে পারবে, তার উপর যদি হজ্জ্ব ফরয হয়ে থাকে এবং সাথে যাওয়ার জন্য কোন মুহরেম পুরুষ থাকে, এমতাবস্থায় স্বামী তাকে অনুমতি দিতে পারবে, এতে তার কোন গুনাহ হবে না। এমনিভাবে পিতামাতাকে দেখতে যেতে, তাদের জন্য শোক প্রকাশ করতে, অসুখ-বিসুখে তাদের খোজ খবর দিতে ও দেখা করতে এবং মুহরেম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন পড়বে না।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গৃহের অভ্যন্তরে স্বামী-স্ত্রীর কাজ কর্মের প্রতি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহঃ) বলেনঃ

"যে কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করা হয় স্বামী ও স্ত্রীকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে, কারণ তার খোরপোষ দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। তাই তার উপার্জনের প্রয়োজন নেই। অনুরূপ সে নফল আমল হিসেবে কোন কাজ করতে চাইলে স্বামী তা থেকে তাকে বিরত রাখতে পারবে "

স্বামীর এ অধিকারের ভিত্তি হচ্ছে, সে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তবে তার আর্থিক সংগতি এ ব্যয় নির্বাহে পর্যাপ্ত না হলে নারী তার জীবন-জীবিকার জন্য চেষ্টা সাধনা করতে পারে। এছাড়াও আল্লামা ইবনে আবেদিনের মতেঃ "নারীর এমন অনেক খরচ আছে যার দায়িত্ব বহন করা পুরুষদের জন্য জরুরী নয়। এ ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্য সে গৃহের মাঝেই কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে।"

এই মূলনীতি হিসাবে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে আর তা হলো, নারী তার স্বামীর অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করার পর ঘরের বাইরে নানা কর্মতৎপরতায় যোগ দিতে কেন পারবে না? সে যদি দাম্পত্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কোন অবহেলা প্রদর্শন না করে তবে গৃহের অভ্যন্তরে তার যেমন চেষ্টা-সাধনার ও কাজ করার স্বাধীনতা আছে তেমনি ঘরের বাইরেও তা থাকা উচিত।

আসলে এ ধরনের প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ শরীয়ত এ দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। ইসলামী শরীয়ত ঘরের চার দেয়ালকে নারীর আখলাক ও চরিত্রের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র মনে করে। এবং ঘরের বাইরে তার আখলাক ও চরিত্রসম্পদ লুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেনঃ

"নারী গোপন রাখার যোগ্য। যখন সে বাইরে আসে শয়তান উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করে।"

বস্তুত ইসলাম দাম্পত্য বন্ধনকে দৃঢ়তর দেখতে চায়। কিন্তু এ বন্ধন এতই স্পর্শকাতর যে তা সামান্য আঘাতেই ভেঙে যেতে পারে। কোন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বামী তার স্ত্রীর অধিক পরিমাণে গৃহের বাইরে যাতায়াত বরদাশত করতে পারে না। কারণ এ থেকে নানা অনাহুত অনাকাঙ্খিত ফিতনার সূত্রপাত ঘটতে পারে।

## ৩. অবাধ মেলামেশা বর্জন

এ সকল বিচার বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, মুসলিম রমণী তার স্বামীর সম্মতি নিয়ে গৃহের বাইরেও বিভিন্ন শিক্ষামূলক, ইসলামী ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে নিজকে আত্মনির্ভরশীল, সফল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী এক আদর্শ মহিলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই সে এ সত্যকে উপেক্ষা করতে পারে না যে, ইসলাম তার ও ভিন্ পুরুষের মাঝে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধি-বিধানের এক প্রাচীর দাঁড় করে দিয়েছে।

তার জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য পারিবারিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেবার একটি মহান উদ্দেশ্য এও যে, ভিন্ পুরুষের সাথে তার অবাধ মেলামেশা যেন নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের কারণ না হয়। যদি কোন নারী খোদার নির্মিত এ দেওয়াল ভেঙ্গে কোন ময়দানে অগ্রসর হতে থাকে তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে তার প্রতিটি পদক্ষেপ গুনাহ ও লানতের পথ অতিক্রম করে। এ ব্যাপারে তার নিয়ত যত সৎ এবং উদ্দেশ্য যতই মহান ও পবিত্র হোক না কেন। কারণ এভাবে সে যেন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেই প্রত্যাখ্যান করে শরীয়ত যার প্রত্যাখ্যাত হওয়া বরদাশ্‌ত করে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক পরহেযগার আর কে হতে পারে? কার নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব তার মহৎ কর্মের গগনচুম্বিতার সমপর্যায়ের হতে পারে? যে সকল নারী ইসলামের হুকুম-আহকাম ও বিধানের প্রতি আনুগত্য শপথ পাঠ করার জন্য তার দরবারে উপস্থিত হতো আজকের কোন নারীর মধ্যে কি তাদের মত সেই পবিত্র আবেগ-অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়? পুরুষরা তো এ ব্যাপারে তার হাতে হাত মিলিয়ে অবিচল থাকার প্রতিজ্ঞা করতো কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "লা তুশরিকনা বিল্লাহে ..... দ্বারা মহিলাদের কাছ থেকে মৌখিক বাইআত গ্রহণ করতেন। অথচ তাঁর হাত কখনো নিজের স্ত্রীগণ ব্যতিত অন্য কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি।'[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শিক্ষা-সংস্কৃতি হোক কিংবা প্রতিরক্ষা ও রাষ্ট্রনীতি হোক সব ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর যেমন নেই কোন সুযোগ-অবকাশ– তেমনি নেই কোন সহশিক্ষার সুযোগ। একজন মুসলিম নারী অন্য পুরুষের সাথে না পারে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে বা নারী-পুরুষের সম্মিলিত মহড়ায় অংশ নিতে, আর না পারে খেলাধুলা ভ্রমণ বা চিত্তবিনোদন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে। আইনসভা পর্যন্ত সর্বত্র নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ বলে গণ্য করা হয়।[২]

সারকথা, কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মনির্ভরশীলতা তথা সামাজিক অগ্রগতি-সমৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত মৌলনীতিসমূহ অনুসরণ করা একান্তভাবে

১. বোখারী শরীফ
২. عورت اسلامی معاشرہ میں

জরুরী। এতে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে তার ভয়াবহ পরিণতি শুধু সংশ্লিষ্ট নারীরাই যে ভোগ করবে তা নয়, বরং এর ফলশ্রুতিতে গোটা সমাজ-জাতিই যে অধপতিত হবে– তা বোধকরি সচেতন পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন।

## জ্ঞানার্জন

ইসলামে জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে। সুনানে ইবনে মাজায় এই সহীহ হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।" (ইবনে মাজা)

এ হাদিসে "প্রতিটি মুসলমান" বলে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে বুঝানো হয়েছে। ফলে পুরুষের সাথে সাথে নারীরও জ্ঞানার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে ইসলামী শরীয়তে।

বস্তুত নারী শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থল হচ্ছে তার নিজের গৃহ। তাই পিতামাতা ও স্বামী যাতে নারীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ এবং ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে– এ ব্যাপারে ইসলাম তাদের দৃষ্টি দিতে বলেছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন তেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

আর দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্য শিক্ষা ছাড়া অন্য পথ নেই। তাই দীনি শিক্ষার আলোকে জীবন গঠন অত্যন্ত জরুরী। এতে দুনিয়ার জীবন– সুন্দর ও অর্থবহ হয়ে উঠে। আর রক্ষা পাওয়া যায় আখেরাতের আযাব থেকে।[১]

## নারীশিক্ষা ঃ পুরুষের দায়িত্ব

শিক্ষা-দীক্ষায় মেয়েদের পিছিয়ে থাকার জন্য বহুলাংশে পুরুষরাই দায়ী। নারী শিক্ষার ব্যাপারে পুরুষের নেতিবাচক মনোভাবের দরুনই এ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটি উপেক্ষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মেয়েদের চাইতে পুরুষের দায়িত্বই অধিক। কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে পুরুষরাই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

নারীশিক্ষার ব্যাপারে উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শনের ব্যাপারে তাদের জবাবদিহী করতে হবে। এক হাদিসে বলা হয়েছে ঃ

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ

---

১. المرأة فى ضوء الاسلامى

অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেকেই রাজা-বাদশাহের ন্যায় আর কেয়ামতের দিবসে প্রত্যেক বাদশাহ বা শাসককেই তার প্রজাকুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাদের দুঃখ-দারিদ্র, সমস্যা-সংকট নিরসনে তিনি কতটুকু উদ্যোগ-প্রয়াস চালিয়েছিলেন? তাদের শিক্ষা-দীক্ষার কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল? এবং দীনি কাজে তাদের জড়িত করা হয়েছিল নাকি দীন থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল?

অনুরূপভাবে প্রত্যেক গৃহের বাদশাহ বা শাসক হচ্ছে পুরুষ। আর গৃহে অবস্থানকারী পরিবারের প্রত্যেকই হচ্ছে তার প্রজা। কেয়ামতের দিসবে সেই জিজ্ঞাসিত হবে তার পরিবারভুক্ত ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীগণ সম্পর্কে।

এভাবে শিক্ষক জিজ্ঞাসিত হবে তার ছাত্রদের সম্পর্কে। এমনিভাবে প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। নারীদের ব্যাপারেও প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, কারণ তারাও পুরুষদের অধীনস্থদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা পুরুষদেরই দায়িত্ব।[১]

হযরত মালেক বিন হুয়াইরিস বলেনঃ আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য রাসূলুল্লাহের কাছে বিশদিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছি তখন তিনি বললেনঃ

"নিজের স্ত্রী পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং সেখানেই অবস্থান কর। এবং তাদেরকে দীনি ইলম শিক্ষা দাও। এবং তা পালনের হুকুম দাও।"[২]

হযরত ওমর (রাঃ) একবার কুফাবাসীদের সম্বোধন করে লিখেছেনঃ

"তোমাদের স্ত্রীদের সূরা নূর শিক্ষা দাও।"

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

"তিন শ্রেণীর মানুষ দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। প্রথমতঃ সেই ব্যক্তি যার অধীনে কোন দাসী আছে সে তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং পরে তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে।? [৩]

এই হাদিসের আলোকে যে ব্যক্তি তার স্বাধীন স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে সেও একটি সাওয়াবের অধিকারী হবে নিঃসন্দেহে। কারণ সে হাদিসে উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের একটি পালন করেছে।

১. খোতবায়ে হাকীমুল ইসলাম
২. বোখারী শরীফ
৩. বোখারী শরীফ

## জ্ঞান চর্চায় নারীর অবদান

ইতিহাসের পাতায় নজর বুলালে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা-দূরদর্শিতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কিভাবে আলোকিত ও সমৃদ্ধ করেছে– তা সম্যক অনুধাবন করা যায়।

আল্লামা ইবনে কাইয়েমের মতে; রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল সাহাবার ফতোয়া সংরক্ষিত আছে তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়েরই ফতোয়া সংকলিত আছে।

এদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের একজনের ফতোয়া সংকলিত করলেই তা এক বিশাল গ্রন্থে রুপান্তরিত হবে। এই সাতজনের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হযরত আয়েশার (রাঃ) মত ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

ফতোয়া দানকারী সাহাবাগণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওসমানের সাথে আছে মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে সালামা। এদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক ফতোয়সমূহ সংকলিত হলে এককেটি ক্ষুদ্র আকারের গ্রন্থ হিসেবে রুপায়িত হতে পারে।

ফতোয়া দানকারী তৃতীয় আরেক দল সাহাবায়ে কেরাম আছেন। যাঁদের ফতোয়া সংখ্যা অতি স্বল্প। এদের মধ্যে আছেন হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হুসাইন (রাঃ), হযরত আবু যর, হযরত আবু ওবায়দা ও অন্যান্য সাহাবাগণ। আর মহিলাদের মধ্যে হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ), হযরত সাফিয়া (রাঃ), লায়লা বিনতে কায়েস (রাঃ), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ), উম্মে শরীফ (রাঃ), আতেকা বিনতে যায়েদ (রাঃ), সাহলা বিনতে সুহায়েল (রাঃ), হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ), হযরত মায়মূনা (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ), উম্মে সালামা (রাঃ), যায়নাব বিনতে উম্মে সালাম (রাঃ), উম্মে আয়মান (রাঃ), উম্মে ইউসুফ (রাঃ) এবং গামেদিয়াও (রাঃ) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১

## হযরত আয়েশা (রাঃ) গোটা উম্মতের শিক্ষয়ত্রী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হচ্ছেন উচ্চপর্যায়ের একজন বিশিষ্ট সাহাবী, এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মোফাস্‌সিরে কুরআন। কিন্তু তিনি এত মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হয়েও বাস্তবে ছিলেন হযরত আয়েশার (রাঃ) সাগরেদ। তাঁর

---

১. عورت اسلامی معاشرہ میں

কাছ থেকেই অধিকাংশ সময়ে জ্ঞান আহরণ করেছেন। কখনো ফতোয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে ছুটে আসতেন।

মূলত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হলেন সমস্ত উম্মতের শিক্ষক, আর তাঁর শিক্ষক হযরত আয়েশা (রাঃ)। এ হিসাবে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশাকে (রাঃ) গোটা উম্মতের শিক্ষিকা বললে অত্যুক্তি হয় না।

কোন কোন সাহাবী হযরত আয়েশাকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বলতেনঃ

مَا هٰذِهٖ اَوَّلُ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ اَبِىْ بَكْرٍ -

"হে আবু বকর পরিবার! এটি তোমাদের প্রথম বরকত নয়।" বরং তোমাদের এত অধিক বরকত অবদান রয়েছে যে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আয়েশার (রাঃ) অনুসন্ধিৎসা আর জ্ঞান লাভের অদম্য স্পৃহা হাজারো সমস্যার জট খুলে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। তিনি তার জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন সব প্রশ্ন করতেন যা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতেন। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন, আর এসব কিছুর মূলে যে বিষয়টি, তা হচ্ছে হযরত আয়েশার (রাঃ) বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন ও এ ব্যাপারে গভীর অনুরাগ ও ঐকান্তিক আগ্রহ।

সাহাবাদের মধ্যে হাদিসের অনেক বড় বড় হাফেজ ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাদের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা দুই হাজার দুইশ দশটি। হযরত আবু হোরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং হযরত আনাস (রাঃ) ছাড়া আর কারুরই বর্নিত হাদিসের সংখ্যা এত অধিক নয়।[১]

হযরত আবু মূসা আশয়ারীর মত পণ্ডিত ও ফেকাহবিদ সাহাবা হযরত আয়েশার (রাঃ) জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তার নিজের ও অন্যান্য অনেকের মত এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা কোন হাদিস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে হযরত আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করতাম। এতে সে বিষয়ে তার কাছ থেকে কোন জ্ঞান লাভ করতাম।"[২]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন ঃ

---

১। শাযারাতুয় যাহাব।

২. তিরমিযী শরীফ

" হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বহু কথা স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন। এবং তার ইন্তেকালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তার অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেছে এবং অনেক বিধি-নিষেধ ও শিষ্টাচার তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, শরীয়তের এক চতুর্থাংশ হুকুম-আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।[১]

অন্যত্র হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে হদিসের জ্ঞানার্জনকারী আটাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এঁরা ছাড়াও বহু সংখ্যক লোক তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস বর্ণনাকারী এ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ), হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম। আরো আছেন বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব এবং নামজাদা ফকীহ হযরত আলকামা ইবনে কায়েস। তাদের মধ্যে যেমন ছিলেন স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।[২]

## দীন প্রচারে হযরত সাফিয়্যার (রাঃ) অবদান

হযরত সাফিয়্যার জ্ঞান থেকে মুসলিম উম্মাহ কতটা উপকৃত হয়েছে তা আমরা মুহায়বা বিনতে হুদায়েরের একটি বর্ণনা থেকে অবগত হতে পারি। তিনি বলেন, হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে হযরত সাফিয়্যার খেদমতে হাজির হলাম। সেখানে পৌছে আমরা কুফার কিছু সংখ্যাক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তারা পূর্বেই সেখানে তার অপেক্ষায় বসে আছে। আমরা তাকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় ও মেয়েদের মাসিক ও নাবিযের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম।[৩]

## হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) অবদান

হযরত উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এ রকম বত্রিশ জন রাবীর নাম-ধাম বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে হাজার বলেন– এ ছাড়া আরো অনেক মানুষ তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এঁদের মধ্যে সাহাবী ও বিখ্যাত তাবেয়ী উভয় শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান।

একবার মরওয়ানের একটি বিষয় জানার প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি বলেনঃ

১. ফাতহুল বারী ঃ ৭ম খণ্ড
২. তাহযীবুত তাহযীব
৩. মুসনাদে আহমদ

"আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ বিদ্যমান থাকতে কোন বিষয়ে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করবো কেন?"

তাই তিনি লোক পাঠিয়ে হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার সে সমস্যার সমাধান জানিয়ে দেন।[১]

## রাবী বিনতে মুআওয়েযের (রাঃ) অবদান

রাবী বিনতে মুআওয়েযের (রাঃ) কাছে বিভিন্ন মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্য কখনো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত হতেন। আবার কখনো উপস্থিত হতেন হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)। তাঁর কাছ থেকে যাঁরা হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আছেন মদীনার বিখ্যাত ফেকাহবিদ সুলায়মান ইবনে ইয়াসির (রাঃ) আম্মার ইবেন ইয়াসিরের নাতি আবু ওয়াবদা, আব্বাস ইবনে ওলীদ এবং ইবনে ওমরের গোলাম নাফের মত সুধীজন।[২]

## ফাতেমা বিনতে কায়েসের (রাঃ) অবদান

ফাতেমা বিনতে কায়েসের (রাঃ) নিকট থেকে যে সকল পণ্ডিত ও হাদিস বিশারদ হাদিস বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেছেন। তারা হলেন কাশেম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রাঃ), উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ), আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) এবং ইমাম শাবীর মত পণ্ডিতবর্গ।

## আমেরা বিনতে আবদুর রহমানের (রাঃ) অবদান

আমেরা বিনতে আবদুর রহমানের বর্ণিত হাদিসসমূহ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের দৃষ্টিতে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি আবু বকর ইবেন মুহাম্মদ ইবেন হাযমকে (রাঃ) তা লিখে রাখার জন্য নির্দেশ দেন। জ্ঞান লাভের জন্য শুধু আমেরা বিনতে আবদুর রহমানের কাছে হযরত আবু বকর ইবনে হাযমই (রাঃ) নন বরং ইমাম যুহরী (রাঃ) এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের মত মহান জ্ঞান সাধকদেরও হাজির হতে হয়েছে।

আসলে উল্লেখিত কয়েকজন মহিয়সী নারীর ইলমী খেদমতের আলোচনা থেকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীদের জ্ঞানচর্চার একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। নতুবা ইতিহাস কোন কালেই কোন শ্রেণীর সামাগ্রিক কর্মকাণ্ডকে আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেনি এবং করতে সক্ষমও নয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামী ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতেই যদি

১. মুসনাদে আহমদ
২. আল ইসতিয়াব

সার্বিক কীর্তি-কাহিনী তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয় তবে তার জন্য প্রয়োজন হবে বৃহৎ কলেবরের এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

## পর্দা

আরবী 'হিজাব' শব্দের বাংলা তরজমা হচ্ছে পর্দা। হিজাবের আভিধানিক অর্থ– বাধা, যবনিকা। পুরুষ ও নারীর নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্মে যাতে উভয়ের কেউ অনধিকার চর্চা না করতে পারে, যাতে কেউ কারো অধিকার ক্ষুন্ন এবং দায়িত্বে অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে। সর্বোপরি যাতে উভয়ের একান্ত সাম্রাজ্যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে কোন সুযোগ না পায় সেজন্য দীনে ইসলাম যে দুর্লঙ্ঘ ব্যবস্থা করেছে তারই নাম হিজাব বা পর্দা। নর-নারীর কল্যাণ কামনায় এহেন ব্যবস্থা অবলম্বনে যৌক্তিকতা কোন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেন না।

মূলত পর্দা প্রথা শুধু নারীর জন্যও নয় বা শুধু নরের জন্যও নয়, বরং উভয়ের জন্য উভয়ের কল্যাণ কামনায়। শুধু নারীই পর্দা করবে পুরুষ এর ব্যতিক্রম এমন কথা নয়, বরং এ কল্যাণকর ব্যবস্থা মেনে চলত উভয়েই বাধ্য। নারীকে যেমন যেখানে সেখানে অবাধ যাতায়াতের, যথেচ্ছা বিচরণের অধিকার দেওয়া হয়নি। তেমনি পুরুষকেও দেওয়া হয়নি যে কোন মুহূর্তে যে কোন নারীর ঘরে অবাধ প্রবেশাধিকার।

নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সেবা-যত্ন যেমন অস্বীকার করা যায় না, ঠিক তেমনি পুরুষকে অধপতনের হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে নারীর ভূমিকাও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

বলা বাহুল্য স্বভাবধর্ম ইসলাম এ জন্য যে রক্ষাকবচ ও অমোঘ অস্ত্র দান করেছে নারী পুরুষের হাতে তারই নাম পর্দা।

বস্তুত পর্দা নারীর গোলামী বা নারীর পরাধীনতার নিদর্শন নয়, নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও নয়, কিংবা তার প্রতি নির্দয়তার পরিচায়কও নয়, বরং এতো নর-নারীর মান-মর্যাদা রক্ষণা-বেক্ষণকারী, তার স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। তার প্রতি বিধাতার পরম করুণা ও মমতার নিদর্শন। এটি বাদ দিয়ে নারীর মান-ইজ্জত, সতীত্ব যেমন বিপন্ন তেমনি পুরুষের জীবনও বিপর্যস্ত বিড়ম্বিত। এর অনুপস্থিতিতে যেমন হয় সত্যিকার ভালবাসা আহত তেমনি মন হয় অশান্ত, ক্ষত-বিক্ষত। ছারখার হয় জীবন-সংসার। এটি ছাড়া নর-নারীর পতন হয়ে উঠে অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য।

তাই ইসলাম নারীকে গৃহ অভিমুখে আহবান করে বলছে,

"তোমরা নিজের ঘরেই অবস্থান কর। অসভ্য যুগের মত নিজ সৌন্দর্য বিকিরণ করে চলোনা। (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

নারীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সাহাবায়ে কেরাম যখন অপরাগতা প্রকাশ করেন তখন হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে এর উত্তর জিজ্ঞাসা করেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন–

"পুরুষের দৃষ্টি এড়িয়ে চলা।"

নারীর সাজ-সজ্জা ও কেশ বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য করতে যেমন পুরুষকে বারণ করা হয়েছে ঠিক তেমনি নারীকেও পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করেছে সে যেন আমাদের সঙ্গে এশার নামাযে হাজির না হয়।"

অপরদিকে পুরুষের প্রতি নির্দেশ এসেছে– "তোমরা যখন প্রয়োজনে অপর রমণীর কাছে কিছু চাইতে যাও, তখন পর্দার আড়ালে থেকেই তোমরা তা চাও। এটা তোমাদের পক্ষে পবিত্রতম ব্যবস্থা।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

নারীকে বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনে ভিন পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে "তোমরা বচন-মাধুর্য্য ব্যবহার করোনা, এতে ব্যধিগ্রস্ত পুরুষ হৃদয়ে কামনার উদ্রেক হতে পারে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

নর-নারীর নিভৃতে অবাধ মেলামেশার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "এমতাবস্থায় পরস্পরের পবিত্রতা হরণে শয়তান তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা অবলম্বন করে।"

তবে তার অর্থ এই নয় যে, নারী সর্বদাই গৃহে অবরুদ্ধ থাকবে। কোন অবস্থায়ই সে এ থেকে বের হতে পারবে না।

আত্মীয়-স্বজন ও বান্ধবীর সাথে সাক্ষাত অনন্যোপায় হলে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী কেনার জন্য হাটে-বাজারে গমন, অসুখে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া, আদালতে সাক্ষী হিসাবে বিচারকের সন্দেহ নিরসনে মুখের নেকাব উন্মোচন করা ইত্যাদি জরুরী পরিস্থিতিতে কোন কিছুই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। ইসলাম শুধু সখের বশে কেশ বিন্যাস ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নর-নারীর পক্ষে অবাঞ্ছিত, অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাইরে বেড়ানো নিষেধ করেছে।

সব পুরুষ সমান নয়। সব নারীও সমান নয়। কিন্তু রাজ পথ যে সকলের জন্য অবারিত। কী ইতর, কী ভদ্র, কী ভণ্ড, কী সাধু রাজপথে সকলেরই অবাধ যাতায়াত। মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে তাই পথ চলা বিপজ্জনক। এহেন পরিস্থিতিতে নারীর অবাধ বহির্গমন যে আশঙ্কামূলক তা নেহাত ন্যায়ের খাতিরেই স্বীকার করতে হয়। অসাধু লোকের প্রসঙ্গ না হয় বাদই দেওয়া হল। লীলাবতী, লাস্যময়ী, তন্বী যুবতীর আকর্ষণীয় অঙ্গ সৌষ্টব ও অঙ্গভঙ্গী দর্শনে সাধু চিত্তও যে কখনো বিচলিত হয় না, হতে পারেনা, তপস্বী হৃদয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ বয়ে যায় না বয়ে যেতে পারে না এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। তাই পূর্বাহ্নেই আত্মসতর্কতা ও নিরাপত্তার খাতিরে সম্ভাব্য যৌনাচার ও নৈতিক অধঃপতন রোধে, দেহ-মনের শুচিতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই যেমন পর্দার প্রবর্তন, তেমনি সাথে সাথে রয়েছে নারীর বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ। নর-নারীর পারস্পরিক এই আকর্ষণ নতুন কিছু নয়, নয় কোন অস্বাভাবিক প্রবনতা। তাদের এই স্বাভাবিক আকর্ষণ যাতে নৈতিক, মানসিক, সমাজিক এবং মানবিক অকল্যাণ ডেকে না আনে, এজন্যই ইসলাম যেমন পর্দার নির্দেশ দিয়েছে তেমনি নারীর বাইরে ঘোরা-ফিরার উপরও আরোপ করেছে নিয়ন্ত্রণ।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে পর্দাহীনতা ছিল ব্যাপক। পর্দার রেওয়াজ তাদের মধ্যে ছিল না। হঠাৎ অস্ত্রপাচার অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়, ইসলাম তাই সূচনাতেই পর্দা ব্যবস্থার কঠোর নির্দেশ না দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। ফলে পর্দাহীনতার অশুভ প্রতিক্রিয়া তারা নিজেরাই উপলদ্ধি করতে সমর্থ হয়। এবং মানবতার কল্যাণ কামনায় তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে পর্দা ব্যবস্থার প্রচার প্রসারে এগিয়ে আসে। এমনকি হযরত ওমর (রাঃ) পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেই একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে সৎ-অসৎ সব ধরনের লোক আসা যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করা আদেশ দিলে খুবই ভাল হত।[১]

তারপর যথাসময়ে ইসলাম ও তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতই পর্দাহীনতা ও পর্দা বিরোধিতার পুরাতন ব্যধির চিকিৎসা আরম্ভ করেন। উম্মুল মোমেনীন হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বাসর রাতেই পাক কুরআনে পর্দা সংক্রান্ত সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়। নির্দেশ আসেঃ "প্রয়োজনীয় বস্তু পর্দার আড়াল থেকে তাদের (নারীদের) নিকট চাও।"

তারপর আরো বলা হলোঃ "বিনা অনুমতিতে পরগৃহে প্রবেশ করোনা।" দাস-দাসী এবং অপরিণত বুদ্ধি ছেলেমেয়েরাও যেন তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে

১. বোখারী শরীফ

গৃহে প্রবেশ করে– ফজরের আগে, দুপুরে নিদ্রাকালে এবং এশার নামায়ের পর। "নর-নারী প্রত্যেকেই যেন দৃষ্টি অবনমিত রাখে।"

আপনা আপনি প্রকাশমান সৌন্দার্য ব্যতিত কোন শোভা-সৌন্দর্য মেয়েরা যেন (পরপুরুষের সম্মুখে) প্রকাশ না করে।" গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন জোরে জোরে পদক্ষেপ করে না চলে।" আরো বলা হলো, "ঘরের মধ্যেই অবস্থান কর। জাহিলী যুগেরর অসভ্যদের মত সৌন্দর্য প্রকাশ করে বিচরণ করোনা। (সূরা নূর ঃ ৩১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মেয়েদের জন্য মসজিদের চাইতে বাড়িতে নামায পড়াই উত্তম। বাড়িতেও অঙ্গন অপেক্ষা নিভৃত গৃহ কোনেই নামায পড়া উত্তম।" (আবু দাউদ)

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাযের জন্য মসজিদ যাত্রায় প্রতি পদক্ষেপে একটি করে নেকী লেখা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ হয়। জামাতে নামাযের মর্যাদা একা নামাযের তুলনায় সাতাশ গুণ বেশি। "মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাযের মান অন্যত্র পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সমতূল্য।"

উল্লেখিত হাদিসসমূহে নামাজের জন্য মসজিদে যাতায়াতে ও এতে সাওয়াবের কথা উল্লেখ করে মূলত মুসলমানদেরকে এ ব্যপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত ইমাম, আবু বরক (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মত মোক্তাদী, আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালমা (রাঃ) এর মত মহিলা ও সাহাবী যুগের পরিবেশ এত কিছু সত্ত্বেও মেয়েদের ব্যপারে ঘোষণা দেন, মসজিদ অপেক্ষা কুঁড়ে ঘরে নামাজই নারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ। একি অকারণে?

বস্তুত নারীর অবাধ বিচরণ এবং পুরুষ পরিবেশে যাতায়াতেই যেহেতু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় অপেক্ষাকৃত বেশি, তাই সমাজ কল্যাণ ও নৈতিক শুচিতা বজায় রাখতে নারীর দায়িত্ব পুরুষের চাইতে অধিক– এ কথা উপলব্ধি করতে কারোরই বেগ পেতে হয় না। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত অমূল্য বাণী নারীকে যেমন পুরুষ পরিবেশ পরিহার, ঘরের বাইরে ঘোরাফিরা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তেমনি বাইরে ঘোরাফিরার মারাত্মক ও বিষময় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন,"নারী যখন ঘরের বাইরে যায়, তখন শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অতএব ঘরে অবস্থান নারীর পক্ষে আল্লাহর করুণা লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।"

তবে যথার্থ প্রয়োজনে নারীর বহির্গমন যেমন ইসলাম নিষেধ করেনা, তেমনি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তারও প্রশ্রয় দেয়না কোন অবস্থায়ই। যথার্থ প্রয়োজনে নারীর ঘরের বাইরে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে ইসলাম পর্দাবৃত হতে বলে এবং পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিংবা তার অন্তরে রেখাপাত করে এমন সাজ-সজ্জা, রং ঢং পরিহার করে চলতে সে নির্দেশ দেয়।

## নারীর দায়িত্ব

হৃদয়ে-মনে, জীবনে-যৌবনে শান্তি-সুখের অমৃত ধারা বইয়ে দেওয়া নারী জীবনের অন্যমত দায়িত্ব ও অন্যতম উদ্দেশ্য বলে যেমন সর্বজন স্বীকৃত, তেমনি গর্ভধারণ, সন্তান জনন, স্তন্যদান এবং নবজাত শিশুর লালন-পালন সৃষ্টির ইতিহাসে নারীজাতির এই চারটি অপরিহার্য দায়িত্ব সম্পর্কেও নারী স্বাধীনতার উগ্র সমর্থকগণও একমত।

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই চার দায়িত্ব সম্পাদনই মূলত নারীজীবনের সার্থকতা। এর উপরই নির্ভর করে সৃষ্টির উজ্জ্বল ভবিষ্যত। বলা বাহুল্য, এই চারটি দায়িত্ব সম্পাদনে নারীকে যে কঠোর যন্ত্রনা আর জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা কেবল ভুক্তভোগীই সম্যক উপলব্ধি করতে পারে।

### ১. গর্ভাবস্থা

গর্ভাবস্থা নারীজীবনের এক অতি সংকটজনক অধ্যায়। এ সময় তার স্বাস্থ্যের পরিচর্যা, তার সুখ-সুবিধার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না দিলে জননী ও তার গর্ভস্থিত সন্তানের জীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

আধুনিক ও প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, গর্ভাবস্থায় মায়ের প্রতিটি আচার-আচরণ, কথাবার্তা, কার্যকলাপ, গতিবিধি, ভাব ও চিন্তাধারা সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ সময় মাঝে মাঝে সন্তানের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। মায়ের হাব-ভাব, মতি-গতি সবকিছুই গর্ভস্থ সন্তানের উপর বিশেষভাবে রেখাপাত করে থাকে। এমনকি সন্তানের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি, রং-রূপ, অভিরুচি কোন কিছুই উল্লেখিত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না।

### ২. প্রসবকাল

প্রসবকাল নারীর জন্য সর্বাপেক্ষা সংকট মুহূর্ত, তার জীবন-মরণ সমস্যা । এবং এ শুধু নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এসময় সামান্য অসতর্কতা সন্তানের

জীবনকেও বিপন্ন করে তুলতে পারে। কখনো এতে মা শিশু উভয়েই প্রাণ নাশের হুমকি হয়ে দাড়ায়।

## ৩. স্তন্যদান কাল

শিশুর স্তন্য পানকালে যদিও মায়ের তেমন বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়না, তবুও সন্তানের জন্য সেই মেয়াদটুকু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের মঙ্গল কামনা, শরীর স্বাস্থ্যের খাতিরেই মাকে সতর্ক থাকতে হয় পদে পদে। স্তন্য দানকালে মায়ের নিজের প্রতি উদাসীনতা অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের স্বাস্থ্যহীনতা ও চিররুগ্নতার কারণ হয়ে থাকে। মায়ের আহার নবজাতকের শরীর-স্বাস্থ্য, মন-মেজাজ ও রুচি-অভিরুচির উপর বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে।

## ৪. লালন-পালন

দুধ খাওয়ানোর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে সুন্দর ভাবে লালন-পালনের দায়িত্ব এসে যায়। এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কচিশিশু নরম মাটি সদৃশ। যেভাবে ইচ্ছা তাকে গড়ে তোলা সম্ভব। তার মন আয়নার মত স্বচ্ছ। দৃশ্যমান যে কোন কিছুরই ছাপ তাতে পড়ে অবলীলায়। ন্যায়-অন্যায়, দয়া-মমতা, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ কিছুই সে বোঝে না, এসব কিছুই তার অপরিচিত "জ্ঞান গুণের উৎস, অজ্ঞতা পাপের মূল"– তার মন একথা জানে না। এই প্রেক্ষাপটে তার স্নেহময়ী জননী যেমন চিত্র তার মনে-প্রাণে অঙ্কিত করার চেষ্টা করবে, যে ভাবধারায় তাকে অনুপ্রাণিত করবে শিশু তাই অনুসরণ করবে সে দিকেই সে আকর্ষণ বোধ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই শৈশবকালে মায়ের কোলে শিশু যেভাবে গড়ে ওঠে এবং সে সময়ে তার মন-মেজাজ, স্বভাব-চরিত্রে যে প্রভাব পড়ে, পরবর্তী জীবনে কোন কিছুই তার আমূল পরিবর্তনে সক্ষম হয় না, হতে পারে না।

বলা বাহুল্য, সন্তান জন্মদান ও তার লালন এবং সন্তান গঠন তথা মানুষ গড়ার অনন্য সাধারণ ও অদ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বিধাতা সোপর্দ করেছেন যে নারীজাতির হাতে, একমাত্র যে নারীকেই দান করেছেন এহেন যোগ্যতা, একমাত্র নারীই করতে পারে যথাযথ ও নিখুঁত ভাবে যে গুরুভার সম্পাদন, সেই নারী– সেই মহিয়সী নারী কি জীবন সংগ্রামে বহির্বিশ্বে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সমকক্ষতা ও প্রতিযোগিতা করে তার মহিমা বজায় রাখতে পারে? কিংবা অবাধ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাত্রায় দুষ্ট বুদ্ধি পুরুষের ভোগের আসরে সখের পুতুল নাচ তার পক্ষে শোভা পায় কী? সে যে একাধারে মানব জাতির গর্ভধারিণী, প্রসবিণী, জননী, শিল্পী এবং শিক্ষিকা।

আসলে প্রকৃতি যেখানে নর-নারীর মাঝে, তাদের দায়িত্বের মাঝে এবং দায়িত্ব সম্পাদনের উপকরণ ও উপাদানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে, সেখানে পাশ্চাত্য জগতের তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে একের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাবার, একের কর্মক্ষেত্রে অন্যকে টেনে আনবার প্রচেষ্টা কি উদ্ভট পরিকল্পনা নয়। "দায়িত্ব হিসাবেই যে পরিবেশ" কর্তব্য হিসাবেই যে কর্মক্ষেত্র" এই চির শাশ্বত বিধান অস্বীকার করা কি বিড়ম্বনা নয়?

## নারী পুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

নারী পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পারস্পরিক দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যবোধের আলোচনা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। বলা বাহুল্য, নারী-পুরুষের এই সৃষ্টিগত স্বতন্ত্রের উপরে ভিত্তি করেই তাদের স্বভাব সম্মত একান্ত কর্মকর্তব্য ও কর্মক্ষেত্রের বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর ইনসাই ক্লোপেডিয়ার উদ্ধৃতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবারও বলছি। এতে 'নারী' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, "জননেন্দ্রীয় হিসাবেই নর-নারীর মাধ্যকার বৈষম্য যদিও অতি সুস্পষ্ট। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্যকার যাবতীয় প্রভেদ এতেই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের মধ্যকার বৈষম্য-পার্থক্য আপাদমস্তক বিরাজমান। নারীর প্রতিটি অঙ্গ এমনকি দেহের যে অংশটি হুবহু পুরুষের মত বলে মনে হয় তাও প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অঙ্গের মত নয় অবিকল বরং যথেষ্ট পরিমাণে ভিন্ন ।

"প্রকৃত পক্ষে নারীর দৈহিক গঠনপদ্ধতি শিশুর গঠনপদ্ধতি সদৃশ। এইজন্য আমরা দেখতে পাই, শিশু যেমন সহজে হাসে, সহজে কাঁদে, মামুলী সুখেও নাচে মেয়েরাও তেমনি অতি অল্পেই আহত, পুলকিত হয়। হাসি-কান্না জুড়ে দেয়। কথায় কথায় চোখে নামে অশ্রুর বন্যা। নারীর এহেন সেন্টিমেন্সি বা দ্রুত অনুভূতি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়া গ্রহণের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক থাকে খুবই কম। এজন্যই তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় স্থিরতার অভাব। সমস্যা সংকটে হয়ে পড়ে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন।

পাশ্চাত্য গবেষকগণ এ তথ্য ও প্রমাণ করেছেন যে, "নারীর দৈহিক দৈর্ঘ্য পুরুষের দৈহিক দৈর্ঘ্যের তুলনায় গড়ে বার সেন্টিমিটার কম। সভ্য-অসভ্য, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, যুবক-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্বত্রই নর-নারীর এ পার্থক্য বিদ্যমান।"

"নর-নারীর দৈহিক ওজনেও এ তারতম্য অনস্বীকার্য। পুরুষের ওজন যেখানে পয়তাল্লিশ কিলো, নারীর ওজন সেখানে গড়ে পাঁচ কিলোগ্রাম কম অর্থাৎ চল্লিশ কিলোগ্রাম।"

"একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নর-নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনপদ্ধতি, ওজন, শক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বৈষম্য হিসাবে নারী পেয়েছে $\frac{১}{৩}$ ভাগ এবং পুরুষ পেয়েছে $\frac{২}{৩}$ ভাগ। পেশীর দ্রুত স্পন্দন সংকোচনের বেলায়ও এই সত্য অতি স্পষ্ট। পুরুষের মাংশপেশীর স্পন্দন নারীর তুলনায় দ্রুত, তীব্র এবং শক্তিশালী।"

**হৃৎপিণ্ড ঃ** মানবের মূল কেন্দ্র হৃদযন্ত্রের বেলায়ও নর-নারীর তারতম্য অবিসম্পাদিত সত্য পুরুষের হৃদয় যন্ত্রের তুলনায় নারীর হৃদয়যন্ত্র ষাট ড্রাম ছোট।"

**নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঃ** নিঃশ্বাশ-প্রশ্বাসের দ্রুততায় নর-নারীর পার্থক্য অত্যন্ত বেশি। পুরুষ যেখানে ঘন্টায় গড়ে এগার ড্রাম কার্বন জ্বালায়, নারী সেখানে জ্বালায় মাত্র ছয় ড্রাম।"

এ থেকে এতথ্যই প্রমাণিত হয় যে নারীর স্বভাবিক উত্তাপ পুরুষের তুলনায় বহুপরিমাণে কম, প্রায় আধা আধি।

প্রখ্যাত দার্শনিক মিঃ প্রাউডন বলেন, নারীর বুদ্ধি যেমন পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষা দুর্বল তেমনি তাহার অনুভূতিও পুরুষের চাইতে যথেষ্ট পরিমাণে কমজোর। নৈতিক শক্তি ও দুর্বলতা হিসাবেও তাদের তারতম্য অনুরূপ । কোনও বিষয়-বিচারে এ কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নর-নারীর মতের মিল হয় না। নর-নারীর মধ্যে এই যে বৈষম্য, এটি সাময়িক নয় বরং সৃষ্টিগত চিরশাশ্বত, চিরন্তন সত্য।"

যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর মানুষের মেধা ও বুদ্ধির পূর্ণতা ও পরিণতি নির্ভর করে, তাতেও নানাবিধ বৈষম্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। প্রকৃতি এখানেও নারীকে পুরুষের পেছনেই রেখেছে। নারীর প্রতি অবিচার করে নয় বরং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের, সৃষ্টির কল্যাণ কামনার পরিকল্পনা অনুসার সুপন্ডিত লিকোলাস ও বেলী সাহেব প্রমাণ করেছেন যে, নারীর পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই পুরুষের পঞ্চেন্দ্রিয় অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল। পুরুষের তুলনায় নারী তিনভাগের একভাগ শক্তি ধারণ করে। অর্থাৎ গড়ে পুরুষের শক্তি নারীর দ্বিগুণ।

**ঘ্রাণশক্তি ঃ** যে পরিমাণ সুগন্ধি এক নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব থেকে নারী অনুভব করতে পারে, পুরুষ সেই পরিমাণ সুগন্ধী এর দ্বিগুণ পরিমাণ দূরত্ব থেকে অনুভব করতে পারে। যে পরিমাণ সুগন্ধি পুরুষ স্বচ্ছন্দে অনুভব করতে পারে, পরিমাণে দ্বিগুণ হলে তবে নারী তা অনুভব করে থাকে। অতি হালকা

ব্রাসিকের গন্ধ যে পরিমাণ দূরত্ব থেকে নারী অনুভব করতে পারে পুরুষ তা অনুভব করত পারে এর দ্বিগুণ দূরত্ব থেকে। এ সত্য বহু পরীক্ষিত।

**স্বাধ ও শ্রবণশক্তি ঃ** পুরুষের তুলনায় নারীর স্বাদ এবং শ্রবণ শক্তিও অনেক দুর্বল। ইনসাইক্লোপেডিয়াতে বর্ণিত আছে, নারীর এই দুর্বলাতর কারণেই স্বাদ-বিস্বাদ, স্বর ও সুরের পরীক্ষক, পিয়ানো বাগিনীর সমালোচক মাত্রেই পুরুষ। আজ পর্যন্ত একজন নারীও এ বিষয়ে নিজকে দক্ষ বলে প্রমাণ করতে পারেনি।

**অনুভবশক্তি ঃ** প্রফেসর লুম্ব্রোজ, "স্যর্জি" প্রমুখ পণ্ডিতগণের সম্মিলিত অভিমত হচ্ছে, নরীর স্পর্শ শক্তিও পুরুষের তুলনায় দুর্বল। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নারীকে যে অসহ্য যন্ত্রনা ও জীবন-মরণ সমস্যায় উপনীত হতে হয় এবং সে তা সহ্য করে থাকে, পুরুষের মত তীব্র এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতি থাকলে নারী সে কষ্ট কোন মতেই সহ্য করতে পারতো না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রসব যন্ত্রনায় নারীর ধৈর্য ও সহ্য শক্তিই এর জ্বলন্ত নিদর্শন। প্রকৃত পক্ষে নারীর অনুভব শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে প্রকৃতি মানবজাতির উপর বিশেষ করুণা করেছে। নতুবা মানবজাতির এহেন সংকটময় মুহূর্তে তার এহেন প্রাণান্তকর কর্তব্য সম্পাদন কিছুতেই সম্ভব হতো না।

**Brain বা মস্তিষ্ক ঃ** মানুষের ধীশক্তি, মেধা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের আধার তার মস্তিষ্ক । এই Brain বা মস্তিষ্কের ওজন, পরিমাণ এবং শক্তি হিসাবেই মেধা এবং জ্ঞান-বুদ্ধির তারতম্য।

সাইকোলজী প্রমাণ করেছে, নর-নারীর Brain আকারে, ওজনে, পরিমাপে, শক্তিতে একে অন্যের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উভয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক তফাৎ। পুরুষের Brain এর ওজন নারী Brain এর তুলনায় একশত ড্রাম বেশি। পুরুষের মস্তিষ্কের শক্তি তার দেহের তুলনায় চল্লিশ ভাগের একভাগ, পক্ষান্তরে নারীর মস্তিষ্ক তার দেহের তুলনায় শক্তিতে পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

মস্তিষ্ক কোষের শিরা-উপশিরা, দাগ ও রেখার প্রভাব মানুষের বুদ্ধি বিচক্ষণতার উপর অনস্বীকার্য সত্য। মস্তিষ্ক কোষের শিরা-উপশিরার আঁকা-বাঁকা রেখার প্রাচুর্যেই বুদ্ধি-বিচক্ষণতার প্রাচুর্য। এটি যত স্বল্প হবে বুদ্ধি-বিচক্ষণতাও তত হ্রাস পাবে। সাইকোলজী ঘোষণা করেছন, নারীর মস্তিষ্ক কোষের শিরা-উপশিরা, আঁকা-বাঁকা রেখা পুরুষের মস্তিষ্ক কোষ অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে কম। তেমনি নারীর মস্তিষ্ক কোষের পর্দা বা আবরণসমূহও অপরিণত। আসলে

নারীজাতির দুর্বলতা আলোচনা করা এখানে উদ্দ্যেশ্য নয় বরং যারা তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে নর-নারীর সমানাধিকারের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেন, এবং নর-নারীর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের মত প্রকৃতির মহান অবদানকে ভুলে যায়, শুধু তাদের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। বস্তুত নর-নারীর এই প্রাকৃতিক ভেদ-বৈষম্যের মাঝেই সৃষ্টির কল্যাণ নিহিত। প্রকৃতির এই মহান অবদানকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করার উপরই নির্ভর করে নর-নারীর সত্যিকার দায়িত্ববোধ, কর্মক্ষেত্র । এরই উপর নির্ভর করে প্রত্যেকের যথার্থ স্বাধীনতার প্রকৃত মানের ব্যাখ্যা ও পরিচয়।

## রোমান সভ্যতায় পর্দা

শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয় বরং জাতীয় জীবনেও পর্দার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ হচ্ছে সুস্থমানুষ ও সুস্থজাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাইতো আমরা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে তার স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই। আমাদের দেশের প্রাচীন ও অভিজাত অমুসলিম পরিবারসমূহে আজো যে পর্দার অল্প-বিস্তর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা মূলত এক কালে এর গুরুত্ব ও জোরালো প্রতিপত্তির প্রতিই ইঙ্গিত করে।

সমাজ ও জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনে পর্দার প্রভাব অন্যতম। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাচীন লীলাভূমি রোমান সাম্রাজ্যের উন্নতির স্বর্ণযুগে রোমান মহিলারা অত্যন্ত কঠোর ভাবে পর্দাপ্রথা মেনে চলতো।

উনবিংশ শতাব্দীর এনসাইক্লোপেডিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "রোমান নারীরা রোমান পুরুষদের মতই কাজ-কর্ম পছন্দ করতো । তারা নিজেদের গৃহেই কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকতো। তাদের স্বামী, পিতা, ভ্রাতা, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করতো। আর তারা গৃহকর্ম সম্পাদানের পর অবসর মুহূর্তে সূতাকাটা, সূতা পরিষ্কার করা প্রভৃতি বয়নশিল্প ও তৎসংক্রান্ত কাজে লিপ্ত থাকতো। রোমান রমণীরা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষ্ঠাসহকারে পর্দা মেনে চলতো, এমনকি তাদের ধাত্রী নারীরাও নেকাব দ্বারা চেহারা আবৃত করে তার উপর একটি মোটা চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকার পরও যাতে অঙ্গ সৌষ্ঠব কেউ দেখতে না পায় তার জন্য একটি 'আবা' ব্যবহার করে বাইরে বেরুত।"

রোমান সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষের অধ্যায়ে এটিই ছিল নারীর পর্দাশীলতা। এমনই ছিল তাদের পর্দানিষ্ঠা। উন্নতির সুউচ্চ শিখরে আরোহনের পরই তাদের

মাঝে ভোগ-বিলাসের অস্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দিল। তারা এতে গা ভাসিয়ে দিল। জাতীয় ঐতিহ্য হলো ভূলুণ্ঠিত।

যেদিন তারা প্রমোদ বিহারে মেতে উঠলো। অপসারিত হল নারীর অবগুণ্ঠন। ঘরের বাইরে এলো নারী। পুরুষের আশে-পাশে, হাটে-ঘাটে, মাঠে চরিতার্থ করতে লাগলো তাদের ভোগের অদম্য স্পৃহা– সেদিন থেকে রোমান সাম্রাজ্যের উন্নতির ভিত নড়ে উঠলো। ক্রমশ তা পতনের অতল গহবরে তলিয়ে যেতে থাকলো। রোমান নারী নাচ-গান, রাজনীতি, সিনেট পার্লামেন্ট ইলেকশন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো। সেদিন থেকেই রাষ্ট্রশক্তি নারীর অঙ্গুলী হেলনে উঠতে বসতে শুরু করলো। নারীর কোমল স্পর্শে রোমান সাম্রাজ্যের বুক ভাঙ্গল। দেখতে দেখতে একসময় ধ্বসে পড়লো রোমান সাম্রাজ্যের গগণচুম্বী মিনার।

"রোমান সাম্রাজ্যের এই পতন-রহস্যের কথা স্মরণ করেই বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষময় ফল এবং অনাগত ভষ্যিত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত মিঃ লুইস প্যারোল বলেন, ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়– রাজনৈতিক এবং জাতীয় অধঃপতনের কার্যকারণ ও নজির প্রতি যুগে একই ধরনের রয়েছে। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, প্রাচীনকালে পরিলক্ষিত পতন-রহস্য, কার্যাকারণ ও দূর্লক্ষণ গুলো সাম্প্রতিক কালেও সমান ভাবে অপরিবর্তিত রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। অর্থাৎ উন্নত চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধের অধঃপতনে নারীর কোমল হস্ত সবচাইতে বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। [১]

সত্য বলতে কি অঘটন অনাসৃষ্টির সকল অভিযোগ একা নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। বস্তুত পুরুষ করেছে নারীর নারীত্ব নাশ, নারী করেছে জাতির সর্বনাশ। নারী এ ভূমিকায় মূখ্য নয়, সে শান্তির আধার। পুরুষ নিজ প্রবৃত্তির ভোগের উপকরণ হিসাবে নারীকে ব্যবহার করেছে নানা চক্রান্তের ফাঁদ পেতে। আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে নিজের সাথে জড়িত করেছে অন্যদেরও। এভাবেই ঘটে পুরো সমাজের অধঃপতন।

মিঃ লুইস আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, রোমান এম্পায়ারের দুঃখের ইতিহাসে যেমন দেখা যায় সাম্রাজ্যের প্রশাসক, পরিচালকগণকে ভোগ-বিলাসে মাতোয়ারা, নারীর সৌন্দর্য-সুধা পানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, ঠিক তেমনি সেই দৃশ্যই সেই ভাবেই ইউরোপে দেখা যাচ্ছে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর এনসাইক্লোপেডিয়া প্রণেতা বলেন, "রোমন সাম্রাজ্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রমণীরা গার্হস্থ্য কর্মে মশগুল থাকতো। তাদের কর্মক্ষেত্রেও ছিল

১. রিভিও অফ রিভিউজ

গৃহ মধ্যই সীমাবদ্ধ। বাড়িতে বসেই তারা সূতা কাটার কাজ করতো। অবশেষে রোমানরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হলো। তারা তাদের ইতিকর্তব্য বিস্মৃত হলো। তাদের এহেন ভোগ বিলাসের পরিণতি আঁচ করতে পেরে তদানিন্তন সমাজদরদী, প্রখ্যাত দার্শনিক মিঃ কার্টিন স্বজাতিকে সতর্ক হওয়ার আকুল আহবান জানান। কিন্তু যে জাতির পতন সুনিশ্চিত, তারা কার্টিনের সুপরামর্শে কান দেবে কেন? ফলে কার্টিনের সকল অনুরোধ উপরোধ সকল আর্তনাদ-ফরিয়াদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। রোমানজাতি যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল।

এনসাইক্লোপেডিয়াতে আরো বলা হয়েছে, " সেদিন কার্টিনের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু তাই বলে কার্টিনের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তিনি যে আশঙ্কা এবং মারাত্মক ব্যধির অনিবার্য আক্রমণ আঁচ করেছিলেন, রোমান সাম্রাজ্যের জাতীয় জীবনে তার নিদারুন ভাবে প্রতিফলন ঘটেছিল। নারী স্বাধীনতা ও পর্দা বিরোধিতার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে মিঃ কার্টিনের উক্তির মাহাত্ম্য ও যথার্থতাও তারা উপলব্ধি করে। তাদের এই উপলব্ধি পরবর্তীকালে জাতীয় ঐতিহ্য ও লুপ্ত মর্যাদার পুনরুদ্ধারে যে নজিরবিহীন নৃশংসতা ও নির্যাতনের পথ বেছে নেয় তা ভাবতেও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে আসে শিরশিরে হিমশীলত স্রোত।

জাতীয় অধঃপতনে নারী স্বাধীনতা, পর্দা বিরোধিতার বিষময় ফল, নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের পর, আত্মসচেতন রোমান পুরুষরা নারীজাতির সঙ্গে যে নির্মম ব্যবহার করেছিলেন তার কিছু নমুনা পেশ করা হচ্ছে পাঠক সমীপে।

"রোমান পুরুষরা তখন রোমান নারীদের জন্য মাংসাহার হাস্য-রসিকতা এমনকি পারস্পরিক আরাম আলোচনা পর্যন্ত নিষেধ করে দেয়। যাতে কথা বলতে না পারে– এজন্য নারীর মুখে এক ধরনের তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু নিম্ন শ্রেণীর নারীসমাজেই এহেন নির্যাতন সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-মূর্খ নির্বিশেষে সর্বত্রই ছিল নারীর এহেন দুর্দশা। ধনী-নির্ধন কোন পরিবারই এ ধরনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এ শোচনীয় দৃশ্যের যবনিকাপাত এখানেই নয়। নির্যানের অপ্রতিরোধ্য অভিযান রোমন সাম্রাজ্যে অধিকতর তীব্র বেগে অগ্রসর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সপ্তদশ শতাব্দির শেষ ভাগে রোমান পণ্ডিত ও মনীষীবর্গের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য ও বিতর্কিত বিষয় ছিল–"নারীর আত্মা আছে কিনা? নারী নির্যাতন পর্ব এখানেই পরিসমাপ্তি লাভ করেছে বলে আপনি মনে করবেন না। শুনে আপনার বিস্ময় ও হৃদকম্প উপস্থিত

হবে যে, রোমান পুরুষরা আবলা নারীকে আলকাতরা মেখে ঘোড়ার পায়ের সাথে বেঁধে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। ঘোড়ার তীব্র গতির সাথে আছাড় খেয়ে বেচারী নারীর অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। কোন কোন রমণীকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নীচে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হত। আগুনের উত্তাপে পুড়ে পুড়ে তার রক্ত মাংশ গলে খসে পড়তো।

ইতিহাসের এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং মর্মন্তুদ অধ্যায় স্মরণ করেই বর্তমান পর্দা বিরোধিতা এবং নারী স্বাধীনতার অনিবার্য আসন্ন ভবিষ্যত সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মনীষীবৃন্দ শঙ্কিত সন্ত্রস্ত। তাই রোমান ইতিহাসের কার্টিনের মতই আজ তার অবর্তমান সভ্যতার বিষময় পরিণতি সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করে পূর্বাহ্নেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে আকুল আবহান জানাচ্ছেন।

ইতিহাসের এ নিষ্ঠুর পরিহাস, রোমন সাম্রাজ্যের এ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে ছিল বলেই হিটলার জার্মান-রমণীদের ঘরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল।

## বিবাহ

মানুষ জন্মগত ভাবে সামাজিক। একাকী নিঃসঙ্গ জীবন তার পক্ষে দুঃসহ দুর্বিসহ। নর-নারীই পৃথিবীর সবুজ চারণক্ষেত্রে, মধুর বাসরে একমাত্র নায়ক-নায়িকা। নীড় বাঁধার আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গী পাবার কামনা তাদের স্বভাবজাত। একজন ঘর বাঁধবে অন্যজন তা আগলাবে , দু'জনে মিলে-মিশে জীবনের মানচিত্র আঁকবে।

তাই নর-নারীর মিলন পথে সব ধরনের বাধার বিন্ধ্যা সর্বত্র দাঁড় করিয়ে রাখলেও যেমন সৃষ্টির গতি ব্যাহত হবে, তার পসার বিনষ্ট হবে, তার জীবনী শক্তির স্পন্দন থেমে যাবে। তেমনি নর-নারীর মিলনক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশার অধিকার প্রদান করলেও উভয়ের জীবনে নেমে আসবে নিদারুন জ্বালা। মানবতা হবে বিপর্যস্ত, কলঙ্কিত, নিস্পেষিত। অথচ নর-নারীর প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যেকের দরকার।

বলা বাহুল্য, অগণিত নর-নারী থেকে কাউকে আপন করে নেবার যে চিরন্তন নিয়ম, যে চিরপরিচিত নীতির বন্ধন তারই নাম বিবাহ। নর-নারীর মেলামেশার এই নিয়ন্ত্রন প্রথা, নিয়ম, নিবন্ধন অবশ্য পালনীয় বলেই সর্বযুগে সর্বসমাজেই এটি স্বীকৃত– অভিনন্দিত। এর ব্যতিক্রম অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত। ধরন-ধারণের হেরফের হলেও অন্যান্য প্রাণীজগতেও দেখা যায় নর-নারীর অবাধ মেলামেশা এবং ব্যভিচার নিন্দনীয়। তারাও পরস্পর মিলনে তাদের সামাজিক প্রথা মেনে চলে, অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করে। বানর, হাতি প্রভৃতি পশুর মধ্যে এর অল্পবিস্তর দৃষ্টান্ত প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

যৌন তাড়না যেমন নর-নারীকে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট করে পরস্পরের কাছে আসতে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি সন্তান লাভ, সন্তান পালন, মানব জাতির স্থিতি, বৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন উভয়কেই সহবাস, সহাবস্থান, সহযোগিতা, সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতিপূর্ণ মিলিত জীবন যাত্রায় বাধ্য করে। একের প্রতি অন্যের, নারীর প্রতি নরের পূর্ণ মিলিত জীবন যাত্রায় বাধ্য করে।

নারীর প্রতি নরের আসক্তি স্বাভাবিক। যথেচ্ছ মিলনের অবাদ অনুমতিতে বিঘ্নিত হবে বিশ্বশান্তি। পৃথিবীর বুকে চলতে থাকবে হানাহানি রক্তারক্তি। ঈর্ষার আগুনে পুড়তে থাকবে নর এবং নারী। ঘর-দোর আর সমাজ-সংসার হবে ছারখার। লুপ্ত হবে মানুষের বংশ পরিচয়। কে কার সন্তান, কার পিতা কে- তা বিশেষ করে বলা হবে দুষ্কর। তাই জীবনের যাত্রা পথে সংগী নির্বাচন করবার আছে নিশ্চিত প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের বিহিত বিধানই বিবাহ বন্ধন।

## বিবাহের গুরুত্ব ও মাসায়েল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ " হে যুবক সকল! তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রীর হক আদায় করার সামর্থ্য আছে, তাদের বিবাহ করা উচিত। (কেননা বিবাহের মাঝে আছে বহু কল্যাণ বিশেষ ভাবে) বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত করে এবং লজ্জাস্থান রক্ষা করে।"[১]

অতএব যদি বিবাহের সামর্থ্য থাকে ও যৌন চাহিদা এত প্রবল হয় যে, বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে এমতাবস্থায় বিয়ে করা ফরজ।২ যৌন চাহিদা প্রবল হলে যদি আর্থিক সংগতি না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় সে মজদুরী করে অর্থ সঞ্চয় করে বিয়ে করবে। কিংবা পরিশোধযোগ্য ঋণ নিয়ে বিবাহ করবে। এতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।

আর যদি যৌন তাড়না নেই, স্ত্রীর হক আদাযের সামর্থ্য আছে- তবে এক্ষেত্রে বিবাহ করা সুন্নত।

আর যদি যৌন ও আর্থিক- কোন ভাবেই স্ত্রীর হক আদায়ের সামর্থ্য না থাকে তবে এমন ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একবার একাফ বিন বিশর আমিমী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলে হুজুর

১. হায়াতুল মুসলেমীন

২. ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে একাফ! তোমার ঘরে কি স্ত্রী আছে? তিনি বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি বাঁদী আছে? একাফ বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর ফজলে তোমার কি অর্থ-কড়িও আছে? একাফ উত্তরে বললো হ্যাঁ ,হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর ফজলে আমার অর্থ– কড়িও যথেষ্ট আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতদসত্ত্বেও যখন তুমি বিবাহ করনি তখন তুমি শয়তানের ভাই, যদি তুমি ইহুদী বা নাসারা হতে তাহলে তাদের সন্ন্যাসী হতে পারতে। কিন্তু আমার তরীকায় এটি নেই।

আমার তরীকায় (ইসলামে) বিয়ে করা উচিত। জেনে রেখ! সবচেয়ে মন্দলোক তারা, জীবিতদের মধ্যে যারা (পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও) বিবাহ ত্যাগ করে আর মৃতদের মধ্যে তারাই মন্দ যারা বিবাহ ব্যতিত মৃত্যুবরণ করে।। তোমরা কি শয়তানের সাথে লিপ্ত থাকতে চাও? জেনে রেখ! নেককার লোকদেরকে শিকার করার জন্য শয়তানের নিকট সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে কামরিপু ও স্ত্রীজাতির দিকে মনের আকর্ষণ। কিন্তু যারা বিয়ে করেছে, তারা এসব অপবিত্র ও ঘৃণিত কাজ হতে পবিত্রতা লাভ করেছে।[১]

## সমতা

মানব-মনে, মানব চরিত্রে মানুষের রুচিতে, মন-মেজাজে বংশ পরিবার এবং পরিবেশের প্রভাব চিরপরিচিত সত্য। বিবাহ বন্ধনকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে পাত্র-পাত্রী এবং উভয় পক্ষের রুচির মিল, আচার আচরণের মিলের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। মূলত এই মহান উদ্দেশ্যই 'কুফু' তথা সমপরিবেশ বা সমগোত্র অন্বেষণ ও নির্বাচনের গুরুত্ব পেয়েছে সে গুলো হলো, বংশমর্যাদা, ইসলাম, দীনদারী, অর্থসম্পদ ও পেশায় সমতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীনদারীর মাঝে সমতার উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তি যে দীনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেনা, অর্থাৎ লুচ্চা-বদমাশ, মদখোর ও পাপাচারীকে নেককার, পুণ্যবতী ও দীনদান মহিলার সমগোত্রীয় ধরা হবে না।[২]

১. জামউল ফাওয়ায়েদ

২. বেহেশতি জেওর ৪র্থ খণ্ড

## মোহর

মোহরের উদ্দেশ্য লৌকিকতা নয় বরং এটি অবশ্য প্রদেয়, পরিশোধ যোগ্য ঋণ এটি বিবাহ বন্ধনের সূচনাতেই স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও তাকে পাওয়ার আকঙ্ক্ষার প্রতীক। আগে হোক পরে হোক এটি পরিশোধ যোগ্য। বিবাহে যদি ঘটনাচক্রে এর উল্লেখ নাও হয়, অথবা এই বিবাহে মোহর নাই বলে যদি পাত্র-পাত্রী দুপক্ষই চুক্তি করে নেয় তবুও মোহরানা মাফ হবে না। অবশ্য বিবাহের পর যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজের মোহরের দাবী ছেড়ে দেয়। মাফ করে দেয়, তবে মাফ হবে এবং স্বামী এই মোহরের দায় থেকে আইনত ধর্মত অব্যহতি লাভ করবে।

মোহরের পরিমাণ উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থিরকৃত হবে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই এই পরিমাণ টাকা অথবা অন্য কোন বস্তু যা সম্পদ হিসাবে পরিগণিত তাই মোহর হতে পারবে। এত অল্প পরিমাণ পয়সা-কড়ি অথবা এমন বস্তু যা অর্থ-সম্পদ হিসাবে সমাজের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় সে রকম কোন কিছু বিবাহের মোহর হতে পারবে না। এজন্যই এক হাদিসে দশ দিরহাম প্রায় আড়াই তোলা রোপ্য অথবা সে পরিমাণ মূল্যের কোন বস্তুই মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

## মোহর আদায়ের নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন মোমিনের জন্য উচিত নয় নিজকে লঞ্ছিত করা। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নিজকে লাঞ্ছিত করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এমন বিপদ সে বহন করে যার সাধ্য তার নেই। (তিরমিযী)

এ হাদিস থেকে একথাই বোঝা যাচ্ছে যে, সাধ্যের বাইরে মোহর ধার্য করা উচিত নয়, যা সে পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখে না।

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, উত্তম মোহর হল তাই যা সহজে আদায় যোগ্য এবং পরিমাণে স্বল্প।[১]

আরেক হাদিসে বলা হয়েছে, মোহরানা ধার্য সহজ কর।[২]

উল্লেখিত হাদিসে একথাই সহজে বোঝা যাচ্ছে, মোহরানার পরিমাণ ন্যূনতম হওয়াই ইসলামী শরীয়তের মর্মকথা। এতে আরেকটি ব্যাপারও লক্ষ্যণীয় আর তা হচ্ছে , পুরুষরা বিয়েতে মোহরানা পরিমাণে অত্যাধিক ধার্যকরে। কিন্তু তা

১. কানযুল ওম্মাল
২. কানযুল ম্মাল

সাধ্যাতীত হওয়ার দরুন তারা তা পরিশোধে ব্যর্থ হয় ফলে স্ত্রীর মনে স্বামীর ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব জাগ্রত হয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। এছাড়া শুরুতেই যদি স্বামী পরিশোধ না করার নিয়তে মোহর ধার্য করে থাকে, তা হলে তো সে খেয়ানত কারী ব্যভিচারী বলে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। হযরত সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করে এবং তার জন্য কিছু মোহরানা ধার্য করে। তারপর সে নিয়ত করে পূর্ণ কিংবা আংশিক মোহর প্রদান না করার। তাহলে সে ব্যভিচারী হয়ে মারা যাবে, এবং ব্যভিচারী হিসাবেই আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।"[১]

বস্তুত আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহরানা ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, অনেকেই তা আদায় করার ইচ্ছাই অন্তরে পোষণ করে না। উপরন্তু মোহরানা অধিক ধার্য করে নির্দ্বিধায় বলে বসে, মোহরানা কে দেয়? কে নেয়? অথচ উল্লেখিত হাদিসে এ ব্যাপারে কত কঠোর ভাবে সতর্ক করা হয়েছে।[২]

## স্ত্রীর জন্য মোহরানা দাবী করা দোষণীয় নয়

মেয়েদের জন্য নিজের স্বামীর কাছে মেহরানা দাবী করা মোটেই অযৌক্তিক কিছু নয়। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়া দোষণীয় নয়।[৩]

## স্ত্রীকে মোহরানা মাফ করতে বলা

স্ত্রীকে মোহরানা মাফ করে দেওয়ার কথা বলা স্বামীর সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদা বোধের পরিপন্থী। এতদসত্ত্বেও স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে মাফ করে দেয় তবে তা মাফ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যদি স্ত্রীকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে মৌখিক মাফের অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে, কিংবা ধোকাবাজির আশ্রয় নেয় বা হুমকি-ধমকির পথ অবলম্বন করে, কিংবা এমন কোন বিষয়ের উপর জোর -জবরদস্তি করে যার দ্বারা সে মাফ করতে বাধ্য হয়, তা হলে এ ধরনের মাফ আল্লাহর নিকট কখনো গ্রহণ যোগ্য হবে না।[৪]

### মোহরানা আদায় করাই উত্তম

স্ত্রী মোহরানা দাবী পরিত্যাগ করলেও স্বামীর আত্মমর্যাদার দাবী হচ্ছে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করে দেওয়া।[৫]

১. কানযুল ওম্মাল, ২. নেক খাবেন্দ, ৩. নেক খাবেন্দ
৪. ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত (২য় খণ্ড)
৫. আশরাফুস সওয়ানেহ (৩য় খণ্ড)

# যৌতুক প্রথা

অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা তথা বর বিক্রয়ের নিয়ম ইসলামে নেই। এটি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড, অনৈসলামিক কুপ্রথা। ইসলাম পাত্রের সঙ্গে পাত্রির, নরের সঙ্গে নারীর, বরের সাথে কনের বিবাহ দিতে আগ্রহী, ধনৈশ্বর্যের সঙ্গে বরের বিবাহ নয়। যে শুভ বিবাহের সূচনাতেই মনের চেয়ে সম্পদের, মানবের চেয়ে জড়বস্তুর , শান্তির চেয়ে অর্থ-কড়ির গুরুত্ব প্রকাশ পায়, তার ভবিষ্যৎ কখনো কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না। যারা মূলত যৌতুকের অর্থ অনুমান করে বিবাহ করে তাদের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে ধনের সঙ্গ। যৌতুকের অর্থের সাথেই তাদের প্রকৃত পরিণয়। স্ত্রীর উপর তাদের অধিকার খাটে না, দাবি চলে না। যৌতুকের জঘন্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। বর-কনের, স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকার মনের মিল এতে সম্ভব হয়ে উঠে না। বস্তুত কোন আত্মসম্মান সচেতন নারীই যৌতুকের পাত্র বা তার আত্মীয়-স্বজনকে মনের সিংহাসনে প্রীতির আসনে বসতে পারে না। ভেসে উঠে তার মনের মুকুরে সদা পাত্র পক্ষের অর্থ– লোলুপতার বীভৎস দৃশ্য।

আর যে ক্ষেত্রে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতামাতা অনূঢ়া মেয়েকে পাত্রস্থ করবার জন্য ভিটেমাটি ছাড়া সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কিংবা অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে শুধু মেয়ের মুখ দেখে, আঁখিজল মুছে, অনাহারে থেকে যৌতুকের টাকা যোগাড় করেছেন, সেখানকার অবস্থা আরো করুণ, আরো মর্মন্তুদ সে দৃশ্য। এহেন পাত্রে পাত্রীপক্ষ যৌতুক দিতে পারে কিন্তু মন দিতে পারে না। মেয়ে দিতে হয় তাই বাধ্য হয়ে দেয়, কিন্তু ভালবাসা দেয়না। পাত্র ও পাত্রী পক্ষকে প্রিয়-পরিজন একান্ত আপনজন না ভেবে নরহন্তা কসাই বলে ভাবতে বাধ্য হয় নারী।

একথা অনস্বীকার্য, যৌতুকের প্রভাবে যেখানে বিবাহের কণ্টকিত হচ্ছে, সেখানে নারী যদি অধঃপতনে যায়, নৈতিক বা দৈহিক আত্মহত্যা করে, তবে সে পাপের গুরুভার শুধু নারীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েই নিষ্কৃতি নেই, সমাজকেও সেই অপরাধের মহাপাপের জন্য পুরামাত্রা দায়ী হতে হবে। এমনকি যদি সমাজের এহেন কুপ্রথার কারণে নারী অবিবাহিত থেকে যায়, বুক বেধে চোখের জলে ভেসে ভেসে জীবন-যাপন করে, তবে সমাজকেই নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসাবে মানবতার আদলতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

অতএব যে অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা নর-নারীর বৈধ মিলনের পথের কাঁটা, বিবাহের প্রতিবন্ধক, নারীর অবমাননা, পুরুষের অপমান, উভয় পক্ষের সম্প্রীতির অন্তরায়, সুখ-শান্তির দুষ্টগ্রহ, অত্যাচার ও ব্যভিচারের পটভূমি– ইসলামের মত দূরদর্শী জীবন ব্যবস্থা তা কখনও পছন্দ করতে পারেনা। কোন স্বভাবধর্ম কোন মানবতা-দরদী-ধর্ম এ ধরনের কুপ্রথার অবকাশ দান করতে পারে না।

তাই যৌতুক প্রথা যে ইসলামে নেই শুধু এতটুকুই নয় বরং এটি ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ প্রথা। প্রকৃতপক্ষে বিবাহ উপলক্ষে পাত্রই দান করবে পাত্রীকে অর্থ-সম্পদ তথা মোহর এই শর্তেই আল্লাহ পাক বিবাহ বৈধতা দান করছেন। তিনি বলেছেন ঃ " অর্থ দ্বারাই তোমরা নারীকে কামনা করবে, নারীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে।" আর এই অর্থের নামই মোহরানা।

পুরুষই ব্যায় করবে নারীর জন্য, পুরুষই দেবে নারীকে এটাই কুরআনের ঘোষণা। এটাই হল জগৎ সংসারে পুরুষের নেতৃত্বের অন্যতম কারণ। যৌতুক প্রথা তাই কুরআন বিঘোষিত পুরুষের এই নেতৃত্বের পক্ষেও অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

পাক কুরআনে বিঘোষিত দাম্পত্য জীবনে প্রীতি-ভালবাসা এবং দয়া-মায়ার অন্তরায় বলেও ইসলামে যৌতুক প্রথা অবৈধ।

মুসলিম সমাজের এ ধরনের ঘৃণ্য প্রথা কখনোই প্রচলিত ছিল না। তাদের ধর্মেও এর অবকাশ নেই। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই দুষ্টব্যধি বাসা বেঁধেছে। বিজাতীয় রীতি-নীতি হিসাবেও এটি ইসলামে নিষিদ্ধ নিশ্চিত ভাবে।

ইসলাম এহেন ঘৃণ্য প্রথার উৎসমুখ বন্ধ করে দিয়েছে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে। আর অত্যন্ত আশার কথা এই যে, বর্তমান কালের সমাজ বিজ্ঞানীগণও এটিকে সামাজিক শান্তি-শৃংখলার পথে অন্তরায় হিসাবে উপলব্ধি করছেন। এবং এ অভিশপ্ত প্রথা রোধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

## অলিমা

বিয়ের দিন নিঃসন্দেহে আনন্দের দিন। এদিন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবাই একত্রিত হয়ে থাকে এই আনন্দঘন মুহূর্তে পাত্র পক্ষকে সাধ্যানুযায়ী এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করা কর্তব্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) হযরত আলীর সাথে বিয়ে দেন তখন তিনি বলেন,

"বিয়েতে অলিমা (প্রীতিভোজ) অবশ্য হওয়া চাই।" আরেক হাদিসে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ"রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের গায়ে জাফরানের রং দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি? তিনি বললেন, আমি বিবাহ করেছি এবং বিবাহে (অনুমানিক) এক তোলা স্বর্ণ মোহরানা দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের দোআ দিয়ে বললেন, একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলিমার আয়োজন কর।"

হযরত সাফিয়্যা বিনতে শায়বা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক বিবাহের অলিমা করেছেন দু'সের যব দ্বারা। (বোখারী)

এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা অলিমার আয়োজনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাই এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু লোকদেরকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা চাই। বিখ্যাত ফেকাহ্ গ্রন্থ 'নাইলুল আওতারে' উল্লেখ করা হয়েছে, অলিমার সর্বনিম্ন সীমা হচ্ছে একটি ছাগল। যদি এ কথার প্রমাণ না থাকতো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছাগলের কমেও অলিমার আয়োজন করছেন, তাহলে কমপক্ষে একটি ছাগলের অলিমা প্রত্যেকের জন্য ফরজ হয়ে যেত।"এর পর কাজী আয়াযের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "ফকীহদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অলিমার আয়োজনে সর্বোচ্চ কোন সীমা নির্ধারণ হয়নি আর অলিমার সর্বনিম্ন পর্যায়ও নির্ধারণ হয়নি। এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"[১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কাউকে যদি অলিমার দাওয়াত করা হয় তবে সে যেন সেই দাওয়াত গ্রহণ করে।"

অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করা অনেক আলেমের মতে ওয়াজিব আর অনেকের মতে মোস্তাহাব। তবে বিভিন্ন কারণে এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ গুলো হচ্ছে ঃ

(১) যদি খাবার সন্দেহ যুক্ত হয়, অর্থাৎ হালাল কিনা তা নিশ্চিত নয়।

(২) যদি উক্ত দাওয়াতে বিত্তশালীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(৩) যদি দাওয়াতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি থাকে যার দ্বারা দাওয়াত গ্রহণ করার দৈহিক বা আত্মিক ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা রয়েছে।

(৪) যদি দাওয়াতে এমন লোকের উপস্থিতি ঘটে যার সাথে তার বৈঠক সমীচীন নয়।

(৫) যদি দাওয়াতকারীর দাওয়াতের সুবাদে কোন হক পরিপন্থী বিষয়ে মেহমানদের সমর্থন বা সাহায্য লাভের উদ্দেশ্য থাকে।

(৬) যদি দাওয়াতী অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কাজ- যেমন নাচ, গান, ছবি তোলা ইত্যাদি করা হয়।

বর্তমানে খুব কম অনুষ্ঠানই এসকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে মুক্ত থাকে। আজকাল দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে খুবই সকর্ত থাকা উচিত। অবশ্য

১. নাইলুল আওতার

যদি এ সকল কাজ থেকে মুক্ত থাকে কোন দাওয়াতের অনুষ্ঠান, তবে তাতে অংশগ্রহণ সাওয়াবের কাজ বলে গণ্য হবে নিঃসন্দেহে।[১]

## অলিমার সুন্নত নিয়ম

বাসর রাত যাপনের পর অলিমা করা সুন্নত। এতে ক্ষমতার বাইরে খরচ না করে এবং লৌকিকতা পরিহার করে সামর্থ্যের মধ্যে থেকে অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে নিজের বিশেষ আপনজন, আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত করে প্রীতি ভোজ দেওয়াই হচ্ছে সুন্নত তরীকা।[২]

## নবীপত্নীগণের অলিমা

হযরত উম্মে সালমার অলিমা অনুষ্ঠানে যবের তৈরী খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করা হয়েছিল। হযরত যয়নাব বিনতে জাহাস (রাঃ)-এর অলিমায় একটি ছাগল জবাই করে উপস্থিত মেহমানদেরকে গোশত রুটি পরিবেশন করা হয়েছিল। হযরত সাফিয়্যার (রাঃ) অলিমায় সাহাবায়ে কেরামদের যার কাছে যা ছিল তাই একত্রিত করে আপ্যায়ন করা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং বলেন, আমার অলিমায় উট, বকরী কিছুই জবাই করা হয়নি। হযরত সাআদ (রাঃ)-এর ঘর থেকে এক পেয়ালা দুধ এনে তা দিয়ে আমার অলিমার ভোজনপর্ব সমাপ্ত হয়।

## হযরত ফাতেমার (রাঃ) অলিমা

হযরত আলী (রাঃ) যে অলিমা করেছিলেন তাতে ছিল এক সা' যব (এক সা' আনুমানিক সাড়ে তিন সের সমপরিমাণ) সাথে কিছু খুরমা ও ময়দা।

উপরের আলোচনায় এ সত্যই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, অলিমার আয়োজন সুন্নত বিশেষ। এতে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে লৌকিকতার আশ্রয় নেবার। বরং সাধ্যমত আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত করে যা কিছু সম্ভব সম্মুখে পেশ করে দেওয়াই অলিমার সুন্নত নিয়ম।[৩]

## বিয়ের আনন্দ

বিয়ে-শাদীতে গীত-গানের সাথে দফ বাজানো যেতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমার নিকট এক আনসারী ছিল, আমি তাকে বিবাহ দিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, গীতের ব্যবস্থা করনি? আনসারীরা গীত পছন্দ করে।"

১. মুসলমান খাবেন্দঃ মাওলানা ইদরিস আনসারী
২. ইসলাহুর রুসুম। ৩. নেক খাবেন্দ

এ হাদিসে যে গীত-গানের কথা বলা হয়েছে তাতে বর্তমান যুগের ঢোল, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান-বাদ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে অর্থপূর্ণ অশ্লীলতা মুক্ত কবিতা পাঠ ও দফ বাজানো।

আরেক হাদিসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এক আনসারী মেয়েকে বিবাহ দিলেন। (যার সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল) ইতোমধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমরা কি মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছ? তারা বললো , হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি ওর সাথে গায়িকাদের পাঠাওনি? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আরে আনসারেরা তো গীতের পাগল, তোমরা যদি কনের সাথে এমন লোক পাঠাতে যে এ ধরণের গজল গাইতো ঃ

"আমরা তোমাদের আঙ্গিনায় এসেছি
আল্লাহ তোমাদেরকে দীর্ঘজীবি করুন আর
আমাদেরকেও দীর্ঘজীবি করুন।"
"যদি এই গম গন্দমী না হতো তবে তোমাদের
মেয়েরা হতো হৃষ্ট-পুষ্ট।
আর যদি কালো বর্ণের খেজুর না হতো
তবে আমরা থাকতাম না তোমাদের পাশে।"

মূলত এ কবিতা আনসারীদের বিবাহ বাসরেই সাধরণত পড়া হতো।

হযরত আমের ইবনে সাদ বলেন, কোন এক বিবাহ উপলক্ষে কারযা ইবেন কাব ও আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। সেখানে কতিপয় বালিকা গজল গাইছিল। আমি তাদেরক বল্লাম, আপনাদের মত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের উপস্থিতিতে এ ধরনের গান -বাজনার অনুষ্ঠান শোভা পায় কী? তাঁরা বললেন, ইচ্ছা হলে তুমি আমাদের সাথে বসে শুনতে পার অথবা ইচ্ছে হলে চলে যেতে পার। বিবাহ শাদী উপলক্ষে এ ধরণের গজল ও বাদ্যের অনুমতি আছে।"

উল্লেখ্য যে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান-বাদ্য সম্পূর্ণ হারাম। অনুমতির ক্ষেত্র সীমিত যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

বস্তুত ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনকে সত্যিকার আনন্দ-উল্লাসের সুযোগ দান করেছে। যেন তাদের জীবন শুষ্ক-নিরানন্দ না হয়ে উঠে।

মানুষ তার স্বভাবের তাগিদে পরিচ্ছন্নতা ও শালিনতার রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দের সাথে সাথে ইবাদতকেও সমন্বিত করে দিয়েছে। এভাবে আনন্দ ও ইবাদত পরস্পর একই সূত্রে ঘেঁথে গেছে। কিন্তু এসব স্বভাবিক আনন্দ-উল্লাসের আড়ালে কোন রকমের নোংরামী অশ্লীলতার বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই ইসলামে।

১. নেক খাবেন্দ

## পরিণয়-নিষিদ্ধ নারী

কুরআন কারীম পুরুষের জন্য বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর নারীকে বিবাহ করা হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে। এটি কোন নতুন বিষয় নয়। মূলত এটি মানবজাতির একান্ত স্বাভাবিক ও মজ্জাগত বিষয়। এর মূলে রয়েছে সাতটি কারণ ঃ

১. আত্মীয়তা.

এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানব সমাজে আত্মীয়তার যে অটুট বন্ধন, মূলত তা পারস্পরিক রক্ত সূত্রেরই বন্ধন। এই সূত্র ছিন্ন করার সাধ্য কারো নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে এ রক্তের মর্যাদা অতি উর্ধ্বে, তাই এ রক্তধারা যতদূর গড়ায় নিষেধের ধারাটিও ততদূর মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে।

বস্তুত প্রত্যেকের জন্যই এটি একটি সীমিত বিশেষ সংরক্ষিত এলাকা। যেখানে নিত্য প্রবহমান দেখা-সাক্ষাত আর শুভেচ্ছা, সৌজন্য বিনিময়। নেই কোন হানাহানি-সংঘাত। সুতরাং এমন পবিত্র রক্তের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন নিজ রক্তের সাথে পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণের নামান্তর নয় কি? ইসলাম কখনও এমন পবিত্র সংরক্ষিত স্থানের অবমাননা বরদাশ্‌ত করতে পারে না।

যাহোক, এই আত্মীয়তার দরুন যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তারা হচ্ছে "পুরুষের শাখা প্রশাখাসমূহ অর্থাৎ তাদের কন্যাগণ এবং তাদের সন্তানগণের সন্তানগণ, এভাবে যতই নিম্নস্তরের হোক না কেন সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

পুরুষের মূল অর্থাৎ তার মাতাগণ এবং তার মাতা ও পিতাগণের মাতাগণ যতই উর্ধ্বে হোক। এবং তার পিতামাতার শাখা-প্রশাখাসমূহ, যতই নিম্নস্তরে যাক। সুতরাং তার ভাই ও বোনদের মেয়েরা তার জন্য হারাম হবে। এবং ভাইদের ও বোনদের সন্তানসন্ততিদের মেয়েরাও হারাম হবে, যতই এভাবে নিম্নে যাক। এবং হারাম হবে একই গর্ভজাত দাদাগণের ও নানীগণের শাখাসমূহ। এ কারণেই ফুফুগণকে এবং খালাগণকে বিবাহ করা হারাম হয়। ফুফুদের, চাচাদের, খালাদের, মামাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা হালাল হয়।[১] কুরআনে কারীমে এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, তোমাদের কন্যাগণ এবং তোমাদের বোনগণ এবং তোমাদের ফুফু আর তোমাদের খালাগণ আর তোমাদের ভাতিজীগণ এবং ভাগ্নিগণ।" (সূরা নিসা)

১. রাদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ড

**২. দাম্পত্য সম্পর্ক**

পুরুষের সহবাসকৃত নারীগণের শাখা-শাখাসমূহ যতই নিম্নে যাক। বিশুদ্ধ বিবাহিত স্ত্রীগণের মাতাগণ এবং তাদের দাদী, নানীগণ যতই উর্ধ্বে যাক। এবং যদিও সেই স্ত্রীগণের সঙ্গে তার সহবাস না হয়ে থাকে। এবং তার পিতা ও দাদাগণের সহবাসকৃত নারীগণ, যতই উর্ধ্বে যাক। তার জন্য বিবাহ করা হারাম।

**কুরআন পাকের ঘোষণা ঃ**

"এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মাতাগণ তোমাদরে জন্য হারাম করা হয়েছে।?

**৩. দুগ্ধ সম্পর্ক .**

রক্ত সম্পর্কের দরুন যে সমস্ত নারী বিবাহ করা হারাম হয়, দুগ্ধ সম্পর্কের কারণেও তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে এও মাতাপিতার একটি অবিচ্ছেদ সম্পর্ক।[১] কারণ সন্তান যেমন গর্ভধারিণী মায়ের রক্তাংশ হয়, তেমনি সে দুধমায়ের রক্ত-মাংস নিংড়ানো দুগ্ধাংশেরও সন্তান। মা যদি নয় মাস গর্ভে ধারণ করে ধ্বংসের কবল থেকে তাকে রক্ষা করে থাকে, তবে দুধমা তাকে এর চারগুণ ৯ × ৪ = ৩৬ মাস বুকে ধারণ করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। সুতরাং জননীর মাতৃত্বের দাবী থেকে দুধমায়ের মাতৃত্বের দাবী কোন অংশেই কম নয়, তুচ্ছ নয় যদিও সে এক বিন্দুও পান করে থাকে। এ মর্মে কুরআন পাকের ঘোষণা ঃ

"এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের দুধমাতাদের এবং তোমাদের দুধবোনদেরকে।" (সূরা নিসা)

**৪. আত্মীয়তা ছিন্নকরণ.**

অর্থাৎ যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করা হালাল, তাদের দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা একজন পুরুষের জন্য হারাম, কারণ এটি আত্মীয়তা ধ্বংসের অনিবার্য কারণ। যেমন চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন, খালাত বোন অথবা কোনও বেগানা নারী, নিঃসন্দেহে এদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু এদের যে কোন দু'জনকে বিবাহসূত্রে একত্র করা হারাম। কারণ এ ধরনের বিবাহে নারীজাতির স্বাভাবিক সতীনত্বের আগুন যে শুধু পারিবারিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তাই নয় বরং তা আত্মীয়তার বন্ধনকেও করে দেয় তছনছ, লণ্ডভণ্ড। এ অর্থেই কুরআন হাকীমের ঘোষণা ঃ .

"এবং হারাম করা হয়েছে তোমাদের জন্য দু'বোনের মাঝে একত্রীকরণকে।" (সূরা নিসা)

১. রাদ্দুল মুহতার

৫. মালিকানা শর্ত থাকা .

যেমন মনিবের দাসী বিবাহ করা ।

৬. যে কোন আসমানী দীনের উপর বিশ্বাস না থাকা।

৭. আযাদ নারীর উপর দাসী বিবাহ করা।[১]

উল্লেখিত নারীগণ ব্যতিত অন্যান্যদের সাথে বিবাহের অনুমতি দিয়েছে ইসলাম চারটি শর্তাধীনে।

১. পাত্রপাত্রী একে অন্যকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ ও বরণ করলো বলে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবে। কুমারী নারী স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তার মৌন সম্মতিকেও ব্যক্ত সম্মতির পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষ কিংবা একবার যার বিবাহ হয়ে গেছে সে রকম রমণী, তথা বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা তালাকপ্রাপ্তা রমণীর মৌন সম্মতি, অস্পষ্ট অনুমতি বা অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি বিবাহ বৈধতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাদেরকে নিজ স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করতে হবে স্পষ্ট ভাষায়। শরীয়তের পরিভাষায় পাত্রপাত্রীর এই স্বীকারোক্তিকেই 'ইজন' বা ইজাব কবুল বলা হয়।

২. এ সকল চুক্তি গোপনে স্বাক্ষরিত হলে চলবে না। পাত্র-পাত্রীর, বর-কনের উক্ত মতের এবং স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একে অন্যকে গ্রহণের অভিব্যক্তি প্রকাশ্যে জনসমক্ষে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ন্যূনতম দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে যৌথভাবে এ পবিত্র বন্ধনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থাকতে হবে।

৩. সাময়িকভাবে যৌনক্রিয়া সম্পাদন ও ক্ষণিক সুখ উপভোগের জঘন্য উদ্দেশ্য থেকে এ বন্ধন মুক্ত থাকবে। পাত্রপাত্রীকে এহেন মনোবৃত্তি পরিহার করে চলতে হবে। আজীবন এ পবিত্র বন্ধন স্থায়ী রেখে মানবতার উৎকর্ষ সাধনই হবে তাদের এই পবিত্র বন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

৪. নারীর প্রতি নিজের আসক্তি এবং তাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করবার পূর্ণ প্রেরণার নিদর্শনস্বরূপ, নারীর সম্মানার্থে যথাসাধ্য কিছু না কিছু সম্পদ অবশ্যই তাকে নিবেদন করতে হবে। ইসলামের পরিভাষায় যাকে মোহর বলা হয়।

পাক কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত শর্ত চতুষ্টয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তারই অধীনে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বিবাহ-বন্ধনকে সার্থক করে তুলতে ইসলাম আরো কতিপয় বিষয় অবলম্বন করে চলতে বাধ্য করে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষকে। নারীর প্রতি, নারীর অভিভাবকের

১. রাদ্দুল মুহতার

প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নারীকে আপন করবার আন্তরিক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে অন্যতম। এই উদ্দেশ্যেই বিবাহ উপলক্ষ্যে পয়গাম পাঠানো এবং মোহরের প্রবর্তন।

## স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

আমি তোমাদেরকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহারের নসিহত করছি, তোমরা আমার উপদেশ স্মরণ রেখ। স্ত্রীজাতিকে পুরুষের পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হাড় হল উপরস্থ হাড়। যা দ্বারা নারীজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তোমরা তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙে যাবে। আর যদি যেভাবে আছে তাকে সেভাবেই রেখে দাও, তবে বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। (বোখারী)

এ হাদিসে সোজা করা বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে তাদের কোন কর্ম তোমাদের মতের বিপরীত না হওয়া। সুতরাং এ চেষ্টায় সফলতা সম্ভব নয়। বরং এতে করে মনের অমিল থেকে তালাক পর্যন্ত গড়াবে। তাই তাদের ছোটখাট বিষয়গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা চাই। তাছাড়া অধিক কঠোরতা কখনো কখনো স্ত্রীজাতির অন্তরে শয়তানের মাধ্যমে বিপরীত চিন্তা-ভাবনার সৃষ্টি করে। তাই এ ব্যাপারে সর্তক থাকা কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যামআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীকে গোলামের ন্যায় প্রহার করো না। কেননা দিনের অবসানে ফের তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে। (তখন কি তুমি লজ্জিত হবে না?) (বোখারী)

বস্তুত নারীজাতির বক্রস্বভাব প্রকৃতিগত। বাঁকা হাড়কে সোজা করবার প্রয়াস যেমন নিস্ফল, এতে হাড় ভেঙে যাওয়া যেমন সুনিশ্চিত, এর বক্রতা সহ্য করে চলাই যেমন যুক্তিসঙ্গত,তেমনি নারীকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে হলে তার সেই প্রকৃতিগত বক্রতাকে সহ্য করে চলতে হবে। অন্যথায় জীবনযাত্রা হয়ে পড়বে দুঃসহ।

কুরআন পাকে এ সম্পর্কে বর্ণিত আদেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে, " মেয়েদের সাথে উত্তমভাবে জীবন যাপন কর। তাদের কোন আচরণ অপ্রিয় হলেও মনে রেখ যে অনেক সময় তোমাদের অনেক অপ্রিয় বিষয়বস্তুর মধ্যেও আল্লাহ তাআলা প্রভূত কল্যাণ নিহিত রাখেন।"

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন এ অবস্থায় একদা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) রাসূল পাকের ঘরে এলেন। দরজায় এসে তিনি হযরত আয়েশাকে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জোর গলায় কথা বলতে শুনলেন। এতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ভীষণ রাগান্বিত হলেন। অন্দরে পৌছে তিনি নিজের মেয়েকে বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি তুমি রাসূলের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছো এবং এ কথা বলেই তিনি মেয়েকে মারার জন্য হাত উঁচু করলেন। পাশেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি হযরত আবু বকরের (রাঃ) হাত ধরে ফেললেন। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে বললেন, দেখ আমি তোমাকে বাঁচিয়ে নিলাম। নতুবা আজ তুমি মার খেতে।"[১]

'ইফকের' ঘটনায় হরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার স্বপক্ষে অহী অবতীর্ণ হলে তাঁর পিতামাতা তকে বললেন, রাসূলুল্লাহের নিকট যাও এবং তার শুকরিয়া আদায় কর। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন,

"না, আল্লাহর শপথ! আমি উঠবো না এবং কারো শুকরিয়া আদায় করবো না আল্লাহ ব্যতিত। তিনিই আমার পবিত্রতার স্বপক্ষে অহী অবতীর্ণ করেছেন।"

এ হাদিসে আপাত দৃষ্টিতে হযরত আয়েশার (রাঃ) এই বাক্যটি ছিল কত কঠোর। তিনি রাসূল পাকের মুখের উপর বলে ফেললেন, "আমি উঠবো না এবং কারো শুকরিয়া আদায় করবো না।" কিন্তু এর অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভৎর্সনা করা নয়। বরং হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রেম-ভালবাসা বিজড়িত এক আবেগময় কণ্ঠে বলেছিলেন কথাটি।[২]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে বললেন, তুমি আমার উপর রাগ হলে আমি বুঝতে পারি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন কথা বলতে গিয়ে বল, "না, মুহাম্মদের রবের কসম" । আর যখন অসন্তুষ্ট হও, তখন বল, "না, ইবরাহীমের রবের কসম।' তখন "মুহাম্মদের রব" বল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনার ধারণা ঠিক। তবে রাগ হলে আপনার নামটুকু শুধু মুখে থেকেই ছেড়ে দেই, অন্তর থেকে নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে যেমন ভালবাসতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও তাঁর প্রেমে ছিলেন দেওয়ানা। তারপরও

১. কিসাউন নিসা
২. কিসাউন নিসা

মাঝে মাঝে বেঁকে বসতেন তিনি। কিন্তু এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই বলতেন না, কারণ এতো কোন অসন্তুষ্টি নয়। বরং এ ছিল পারস্পরিক ভালবাসা ভিত্তিক মান-অভিমান।

বিষয়টি এমন, যেন কোন প্রজা রাজার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে। কিন্তু রাজা তাকে শাস্তি দেন না, বরং তার মনোবাসনা পূরণ করেন। এর অর্থ তো এই নয় যে, এ ক্ষেত্রে রাজা তাকে শাস্তিদানে অক্ষম। বরং এতো রাজার সীমাহীন ঔদার্য দয়ার্দ্রতার নিদর্শন। যার দরুন রাজা তার প্রজার সাথে এমন আচরণ করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ এর চাইতে নিম্নপর্যায়ের তো নয়ই বরং এর চাইতে সমৃদ্ধ, চিরমহান।[১]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঈমান তার পরিপূর্ণ, ব্যবহার যার উত্তম। নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি।"

তিনি আরো বলেন, কোন মোমেন স্বামীই যেন তার স্ত্রীকে বিষদৃষ্টিতে না দেখে। স্ত্রীর একটি ব্যবহার অপ্রিয় হলেও অপরটি প্রিয়।"

অর্থাৎ স্ত্রীর শুধু দোষ দেখাই উচিত নয়, তার গুণও দেখা উচিত। তার মধুর আচরণগুলো লক্ষ কর। জানি, সে রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সারা জীবনের সকল স্নেহ-ভালবাসা মুহূর্তে অস্বীকার করতে তার বাধে না। কিন্তু সন্তুষ্ট এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এই স্বামীর জন্যই তার মন-প্রাণ, যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। অতএব তাদের কল্যাণামৃত পান করতে হলে তোমাদেরকে একটু ধৈর্য ও সহ্য করতে হবে। কুসুমের জন্য কাঁটার আঘাতের মতই নারীর মাধুর্যের জন্য তোমাদেরকে একটু রয়ে সয়ে চলতে হবে।

## স্বামীর উপর স্ত্রীর হক

হযরত হাকীম ইবনে মুআবিয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি একবার রাসূল পাকের (সাঃ) খেদমতে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক হলো, স্বামী আহার করলে স্ত্রীকেও আহার করাবে। এবং স্বামী কাপড় পরলে স্ত্রীকেও কাপড় পরাবে। (শাসন বা আদরের জন্য মারতে হলে) মুখমণ্ডলের উপর মারবে না। (কঠোর শব্দ বলতে হলে পিতামাতার নাম নিয়ে) অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি দেবে না। রাগ দেখাতে হলে ঘর থেকে বের না করে, ঘরে রেখেই রাগ দেখাবে। (আবু দাউদ)

১. কিসাউন নিসা

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদিসে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক ব্যক্তির ফযিলত বর্ণনা করলেন যার নিকট একটি ক্রীতদাসী রয়েছে। তাকে সে উত্তমরূপে শিষ্টাচার ও জ্ঞানদান করেছে। (বোখারী)

উল্লেখ্য যে, ক্রীতদাসীর চেয়ে স্ত্রীর হক বেশি। তাই তাকে দীনি ইলম শিখালে তার ফযিলত কি পরিমাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বেও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।"
(সূরা তাহরীম)

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "তোমরা নিজ গৃহে অবস্থানকারী প্রত্যেককে দীন-ধর্মের কথা শিক্ষা দাও।"

এ হাদিস থেকে এ কথাই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, স্ত্রী-পুত্রদের দীনি শিক্ষা দেওয়া ফরজ। অন্য কথায় দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ সাহাবী রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা পর্দার ভেতরে চলে যাও। আমরা আরজ করলাম, তিনি তো একজন অন্ধ লোক আমাদেরকে চিনবেন না, দেখতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তিনি অন্ধ বটেন, কিন্তু তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাবে না?"

সুতরাং স্ত্রীকে এমন পূর্ণাঙ্গ পর্দায় রাখা জরুরী যাতে কোন পরপুরুষ তাকে দেখতে না পায় এবং সেও কোন পরপুরুষকে দেখতে না পায়। এতেই স্ত্রীর দীনদারী সংরক্ষিত হতে পারে। আর এ অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই সকলের আছে যে, যে বস্তুটি মানুষের অতি মূল্যবান সে বস্তুটি সাধারণত গোপন করে রাখা হয়। আর যে বস্তু যত বেশি সাধারণ মানুষের চোখে ভেসে বেড়ায় সে বস্তুর মূল্যমান তত বেশি হ্রাস পায়। পর্দার ব্যাপারটি ঠিক তদ্রুপ। কেননা স্ত্রীর সাথে যতই সম্পর্ক গভীর হবে ততই তার হক বাড়বে। তার ইজ্জত-আব্রু, দীনদারী রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পর্দাপ্রথার মাধ্যমেই দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা নিহিত। এর প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের কর্তব্য।[১]

---

১. হায়াতুল মুসলেমীন

## সার সংক্ষেপ

১. নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। কৃপণতা না করা।

২. স্ত্রীকে দীনি মাসায়েল শিক্ষা দেওয়া এবং নেক আমলের তাগাদা দেওয়া।

৩. মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া।

৪. তাদের অসাবধানতা ও বুদ্ধির অভাবে যে সব ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, সেগুলোর উপর ধৈর্যধারণ করা। কখনো শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।

৫. হায়েয বা মাসিক চক্রের হুকুম-আহকাম নিজে শিখে তাদেরকে শেখানো। নামায ও দীনদারীর তাগাদা দেওয়া। বেদআত ও শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা।

৬. প্রয়োজনমত যৌন মিলন।

৭. প্রয়োজন ব্যতিত তালাক প্রদান না করা।

৮. মাত্রাতিরিক্ত প্রহার না করা।

৯. অনুমতি ব্যতিত আযল না করা।

১০. উপযুক্ত বাসস্থান দেওয়া।[১]

## স্ত্রী ও মাতাপিতার হকের মাঝে ভারসাম্য

ইসলামে মাতাপিতার হক আদায় করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে তা কোন পর্যায়ে কি পরিমাণ তা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

মাতাপিতার আনুগত্যের পাশাপাশি স্ত্রীর যে সকল হক ইসলাম ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলো আদায় করতে যদি মা-বাবা নিষেধ করে, তাহলে এক্ষেত্রে তাদের নির্দেশ পালন জায়েয নেই। যেমন কোন ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা এরূপ যে, মাতাপিতার খেদমত করতে গেলে স্ত্রী-পুত্রের কষ্ট হয়। তাহলে তার জন্য স্ত্রী-সন্তানদের কষ্ট দিয়ে মাতাপিতার খেদমত করা জায়েয নয়। দুররে মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কারো পিতা এবং ছেলে উভয়ই বিদ্যমান তবে পিতার চেয়ে ছেলে অধিক হকদার। কেউ কেউ বলেছেন উভয়ের মাঝে বন্টন করে দেওয়া চাই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, পিতা যদি অস্বচ্ছল হয়, তবে সন্তানের সম্পদ থেকে খরচ করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করবে। আর

১. হুকূকুল ইসলাম

যদি পিতা ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের সম্পদ থেকে খরচ করে, তাহলে পিতার উপর তা ঋণ থেকে যাবে। ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মত এটাই।

মেশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মেরকাতে উল্লেখ করা হয়েছে, মাতাপিতার সাধারণ নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জরুরী নয়, যদিও এতে মাতাপিতা মনে খুব কষ্ট পায়। কেননা এতে সন্তান কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হতে পারে। আর এ অবস্থায় পিতামাতা অনেক সময় সন্তানের কষ্ট উপলব্ধি করে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক থাকার কথাও মুখ ফুটে বলেন না। অথচ পিতামাতা থেকে পৃথক থাকার দাবী করা স্ত্রীর অন্যতম অধিকার। সুতরাং স্ত্রী যদি মাতাপিতার সাথে একত্রে না থেকে পৃথক থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহলে স্ত্রীকে জোরপূর্বক মাতাপিতার সাথে একত্রে রাখা স্বামীর জন্য জায়েয নেই। বরং এ ক্ষেত্রে তাকে পৃথক রাখা ওয়াজিব হয়ে পড়বে।

দুর্‌রে মুখতারের ভরণ-পোষন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, স্ত্রীকে এমন ঘর দেয়া ওয়াজিব, যে ঘরে অন্য স্ত্রী অথবা স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকে। [১]

## স্ত্রীর জন্য পৃথক ঘর

স্বামী যদি স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত দ্বারা বুঝতে পারে যে, স্ত্রী পৃথক থাকতে চায়, কিন্তু লজ্জায় মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না, তথাপি (আপনজনদের সাথে) একত্রে রাখা জায়েয নেই। অবশ্য এখানে এতটুকু অবকাশ রয়েছে যে, যদি স্বামী আলাদা ঘর দিতে সমর্থ না হয়, তবে অন্তত বড় ঘরে তার জন্য পৃথক একটি কামরা নির্মাণ করে দেবে, যাতে সে তার প্রয়োজন পূরণ হয়। সেই কামরায় তার আসবাবপত্র নির্দ্বিধায় রাখতে পারে। স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে একান্তে উঠা-বসা, কথাবার্তা বলতে পারে। ওয়াজিব আদায়ের জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

## স্ত্রীকে আপনজন হতে দূরে রাখাই নিরাপদ

বর্তমান যুগের মানুষের মন-মেজাজ ও এ থেকে সৃষ্ট নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে এটাই যুক্তিযুক্ত যে, স্ত্রী যদি স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে একত্রেও থাকতে চায়, আর আত্মীয়-স্বজনরাও স্ত্রীর পৃথক থাকাতে অসন্তুষ্ট হয়, তথাপি স্ত্রীকে পৃথক রাখাই কল্যাণকর ও দূরদর্শিতা। এতে হাজারো অনিষ্টের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য প্রথমদিকে এ ধরনের পদক্ষেপে হয়ত দু'চারদিন আত্মীয়-স্বজনদের কটু কথা শুনতে হতে পারে, কিন্তু এটি সাময়িক। এক সময় হয়ত তারা যখন এর কল্যাণকর দিকগুলো উপলব্ধি করতে পারবে, তখন তারা

২. হুকূকুল ওয়াল্দািদাইন

নিজেরাই সন্তোষ প্রকাশ করবে। বিশেষভাবে রান্নার জন্য চুলা পৃথক থাকা উচিত। কারণ অধিকাংশ সময় রান্নাবাড়ার চুলাকে কেন্দ্র করেই ঝগড়া-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়।[১]

## স্বামী মৃত স্ত্রীর মুখ দেখতে পারে

কিছু লোক স্বামীকে তার মৃত স্ত্রীর মুখ দেখতে দেয় না এবং তার লাশের খাট বয়ে নিতে দেয় না। এটা অত্যন্ত বাজে কথা। মৃত স্ত্রীকে বিনা প্রয়োজনে স্পর্শ করা জায়েয নেই বটে, তবে তার মুখ দেখা জায়েয ও খাট ধরে নেওয়া মোস্তাহাব। এমনকি তাকে কবরে নামানোর সময় কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে, অন্য কারো চেয়ে স্বামীর অধিকার বেশি। স্ত্রীর জন্য তো মৃত স্বামীকে দেখা ও তাকে স্পর্শ করা সম্পূর্ণ জায়েয।[২]

## একাধিক বিবাহ

ইসলাম বহুবিবাহ অনুমোদন করলেও এতে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেনি। বিবিধ শর্ত আরোপ করে বহুবিবাহের নামে স্বেচ্ছাচারিতার এবং নারীর প্রতি অন্যায়-অবিচারের কণ্ঠারোধ করে দিয়েছে। একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার এবং ন্যায়বিচারে সমর্থ পুরুষকেই শুধু প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ করবার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। এ ধরনের ন্যায়বিচার যে সহজসাধ্য নয় এদিকেও সতর্ক করে একাধিক বিবাহের উগ্র কামনাকে সংযত রাখার প্রয়াস চালিয়েছে। বলা হয়েছে যে, "ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে যদি আশঙ্কা কর তবে এক বিবাহেই তৃপ্ত থাক।" এবং "শত ইচ্ছা থাকলেও তোমরা মেয়েদের মধ্যে যথাযথভাবে ইনসাফ কায়েমে সমর্থ হবে না" বলে কুরআনের ঘোষণাই উপরোক্ত উক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ। (সূরা নিসা)

হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার দুইজন স্ত্রী আছে, সে যদি তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার না করে, তবে কেয়ামতের ময়দানে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাজির হবে।"

হাদিসের এই ঘোষণা যেমন বহু স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ এবং ন্যায়দর্শিতায় বাধ্য করেছে, তেমনি বহু বিবাহ যে কঠিন পরীক্ষা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করেও বহু বিবাহের বাসনাকে সংযত রাখতেও প্রয়াস পেয়েছে।

---

১. নেকখাবেন্দ

২. ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত

ইসলামে বহুবিবাহ অনুমোদিত থাকলেও যত ইচ্ছা বিবাহ করার অধিকার নেই। একই সময়ে চারজনের অতিরিক্ত স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধন একজন পুরুষের পক্ষে ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যত প্রয়োজনই হোক না কেন স্বাভাবিকভাবে চারজনের বেশি স্ত্রীর বিবাহবন্ধনে পুরুষ বাধ্য হয় না, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে চারজনই যথেষ্ট। তাই ইসলাম চারের সংখ্যা পর্যন্ত বহুবিবাহকে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছে।

কুরআন পাকের ঘোষণা অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই চারের অতিরিক্ত বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবধি অধিকারের অপব্যবহার করেননি। এক সাথে নয়জনের বেশি স্ত্রী তাঁর বিবাহে ছিলেন না। তাঁর বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে এক ধরনের হীনপ্রবৃত্তি মানুষেরা যে সকল অপ্রিয় উক্তি করে নিজেদের দেহ-মন কলুষিত করে, তাদের উদ্দেশ্য করেই কিছু কথা পেশ করছি ঃ

যিনি পঁচিশ বৎসরের ভরা যৌবনে তার চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠা এক বিধবাকে বিবাহ করে একমাত্র তাকে নিয়েই যৌবনের পঁচিশটি বসন্ত তথা পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। ভরা যৌবনে অনায়াসে আরবের সেরা সুন্দরী যুবতী, ধনী-মানী রমণীদের বিবাহের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেও যিনি নিঃসংকোচে অবজ্ঞাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরও যিনি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও একজন মাত্র এবং তার সারাটি জীবনে এই একজন কুমারী নারীর পাণি গ্রহণ করেন। যাঁর একটি ব্যতিত সকল বিবাহই পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর। যার একজন স্ত্রী ব্যতিত সকলেই ছিলেন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা– এ সকল অবস্থার প্রেক্ষাপটে বার্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি যৌনাচারে মেতেছিলেন বলে যারা অভিযোগ করে, তাদেরকে আর যাই বলা হোক না কেন সুস্থ মস্তিষ্ক, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোন মতেই বলা যেতে পারে না। বস্তুত বিশ্বমানবতার কল্যাণ কামনায়, মানবতার উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহুবিবাহের অপরিহার্যতা ও মহৎ অবদান যে কোন নিরপেক্ষ ইতিহাসবেত্তা মাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য। [১]

## একাধিক স্বামী

একাধিক বিবাহ পুরুষের জন্য অনুমোদিত, অবারিত। তাই কারো মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, তাহলে নারীর জন্য একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ এবং বহুস্বামী সান্নিধ্যের পথ কেন থাকবে চির নিষিদ্ধ? এ কি অবিচার নয়?

১. মাওলানা আবু তাহের (কালকাতা)

**পুরুষের যদি বহুবিবাহের অধিকার দেওয়া হয়, তবে নারীকে কেন বহু বিবাহের সুযোগ দেওয়া হবে না?**

এ স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, নারীকে এ অধিকার দিতে আপত্তি ছিল না তবে প্রশ্ন হয় যে, যে সমস্ত অনিবার্য কারণে পুরুষ যুগপৎ বহুবিবাহ করতে বাধ্য হয়, নারী জীবনে তার কতখানি সত্যিকার প্রয়োজন আছে? তদুপরি এহেন অবস্থায় আছে নারীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগার আশঙ্কা এবং একাধিক পুরুষের ভোগের পাত্রী হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন অপমান বোধের বহিঃপ্রকাশ।

শুধু ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ও যৌনতৃপ্তিই তো বিবাহ বন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়- এ কথা যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তবে জিজ্ঞাস্য যে, একাধিক স্বামীর স্ত্রী হিসাবে সকলের প্রতি নারী কি তার যথা কর্তব্য ও নারীত্বের কঠিন দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে কি? সকলের ঘরসংসার, ধন-দৌলত সামলে গৃহকর্ত্রীর মহিমা-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে তো?

## সন্তান সমস্যা

নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়, আর তা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে সন্তান কার হবে? একটি লোক যদি একাধিক ক্ষেত্রে চাষাবাদ করে, তবে উৎপাদিত ফসল যে তারই পরিশ্রমের ফল এ কথা নিশ্চিত এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু যদি একই ভূমিতে একাধিক ব্যক্তি পানি সরবরাহ করে ফসল ফলানোর চেষ্টা করে, তবে উৎপন্ন ফসলের অধিকার এবং ভাগাভাগি নিয়ে মস্ত বড় গোল বাঁধবে- এ কথা বলার বোধকরি অপেক্ষা রাখে না। উৎপন্ন ফসল যে সকলেরই পরিশ্রমের ফল একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবু হয়ত সেখানে একটা সমঝোতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সন্তানসন্তুতির বেলায় যে তাও সম্ভব নয়। একাধিক স্বামী-সংসর্গ প্রাপ্তা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যে, কোন্ স্বামীর ঔরসজাত- এ কথা কে বলে দেবে? আর যদি সন্তান একটি মাত্র হয় তবে তাকে নিয়ে সকলের লড়াই থামাবে কে? তা ছাড়া একাধিক সন্তানের বেলায় সুন্দর-অসুন্দর ছেলেমেয়ে নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধবে না এ কথাও নিশ্চিত নয়। তদুপরি ছেলে কার ঔরসজাত, মেয়ে কোন স্বামীর, অসুন্দরের প্রকৃত জনক কে? এসব কিছু যখন নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই, তখন কার সন্তান কাকে দেওয়া হবে? আইন এ অবস্থায় কখনও প্রকৃত সত্যের উদ্ধার ও প্রকৃত পিতার পরিচয় দিতে সক্ষম নয়। মোটকথা, বহু স্বামীর বেলায় ভূমিষ্ঠ সন্তানের যথার্থ জনকের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার অসম্ভব থেকে যাবে। বলা বাহুল্য এ বিষয়টি সন্তানের সম্মানের পক্ষে অতীব লজ্জাজনক।

যৌন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও নারী জীবনে যৌথভাবে একাধিক স্বামীর প্রয়োজন নেই বলা যায়। বহুবিবাহে বাধ্য বা একাধিক স্বামীগ্রহণ অপরিহার্য, এমন প্রশ্নই উঠে না। প্রকৃতিই তাদেরকে এহেন অবাধ অধিকার প্রদানের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। নারীর ঋতু এবং গর্ভকাল, প্রসব পরবর্তী স্রাব, নবজাতককে স্তন্যদানকাল প্রভৃতি বিচার করে দেখলেই সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-শ্রোতা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। ইসলামে ঋতুকালে (যা সর্বোচ্চ দশদিন), সন্তান জন্মের পর স্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত (তবে চল্লিশ দিন পরে নয়) স্ত্রীসহবাস হারাম। স্ত্রীর গর্ভকাল এবং স্তন্যদানকালে সহবাস নিষিদ্ধ না হলেও স্বভাবতই মেয়েদের যৌন তাগাদা তখন অপেক্ষাকৃত সংযত ও স্তিমিত থাকে। কিন্তু পুরুষদের বেলায় প্রকৃতিগত এ ধরনের কোন বাধা-বন্ধন নেই। বরং নারীর ঋতু, প্রসব পরবর্তী স্রাবকাল, গর্ভকাল, স্তন্যদানকালের প্রতি একটুখানি লক্ষ্য করলেই বুঝতে বাকি থাকে না যে, এহেন নারীর পক্ষে একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ তার শরীর-স্বাস্থ্য, জীবন-যৌবন, সুখ-শান্তির জন্য জ্বলন্ত অভিশাপ।

এ সমস্ত কারণেই ইসলাম মেয়েদের বহু বিবাহ তথা যৌথ স্বামী গ্রহণ অনুমোদন করে না। নারীকল্যাণ ও মানবকল্যাণের খাতিরেই একে ব্যভিচার সদৃশ বলে ইসলাম ঘোষণা করে।

## নারীজীবনে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার

নারীজীবনেও যে দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন অনিবার্যভাবে দেখা যায় না এমন কথা বলা দুষ্কর। তবে যৌথ স্বামী গ্রহণই এর সমাধান নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামী চিররুগ্ন, পঙ্গু, পুরুষত্বহীন, নিরুদ্দেশ, পাগল, স্ত্রীর ন্যায্যদায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম, কিংবা অত্যাচারী হয় অথবা তার সঙ্গে মিল-মহব্বত না হয় তাহলে ' খোলা' করবার অথবা ইসলামী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ইসলাম নারীকে দান করেছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে ইসলামী আদালতের ডিক্রিই নারীকে মুক্তি দান করবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী আদালত না থাকায় এহেন মামলার নিষ্পত্তি বেশ জটিল হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে নিষ্পত্তির পথ বন্ধ হয়নি। এ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট শর্তাধীনে গঠিত পঞ্চায়েতকেই এহেন দুরূহ দায়িত্ব পালনের অধিকার ইসলাম দান করেছে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ আলেমের নিকট এ ধরনের পঞ্চায়েত গঠন ও তাদের বিচার ধারার নিয়মনীতি জানা যেতে পারে।

বস্তুত জন্ম ও প্রকৃতিগতভাবে নারী-পুরুষের অবস্থা পরস্পর ভিন্ন। এ কারণেই ইসলাম একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকার বিষয়টি সঠিক মনে

করে না। তবে বৈধভাবে সে যেন যৌনতৃপ্তি লাভ করা থেকে বঞ্চিত না থাকে তা নিশ্চিত করা ইসলাম জরুরী মনে করে। তাই সে যতটা জোরালোভাবে পুরুষের বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে, নারীর বিয়ের জন্যও ততটা জোরালো ভাবেই চাপ সৃষ্টি করে। যদি বৈধব্য বা তালাক বা খোলা তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে অবিলম্বে পুনর্বিবাহ দিতে ইসলাম সমাজকে তাগিদ দেয় ও উৎসাহিত করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে অতি সহজেই নারীদের দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে যেতো।

আতেকা বিনতে যায়েদের বিবাহ হয়েছিল হযরত আবু বকরের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লাহের সাথে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন। তিনি পিতার পরামর্শে স্ত্রীকে তালাক দিলেন বটে, কিন্তু এ কাজের জন্য তার যথেষ্ট দুঃখ ছিল। কারণ তিনি আতেকাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। আবদুল্লাহর আগ্রহ-আকর্ষণ দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) আতেকাকে পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি দেন। আবদুল্লাহ তাকে আবার বিবাহ করেন। তায়েফের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ শহীদ হন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী এরপর যায়েদ ইবনে খাত্তাব আতেকাকে বিবাহ করেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে হযরত ওমর (রাঃ) এবং তারপর হযরত যুবায়েরের (রাঃ) সাথে তার বিয়ে হয়। হযরত যুবায়েরের (রাঃ) শাহাদাতের পর হযরত আলী (রাঃ) তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতেকা এতে সায় দেননি।

সুহায়লা বিনতে সুহাইলের বিবাহ হয়েছিল পরপর চারজন অর্থাৎ হযরত হোযায়ফা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ এবং শামাখ বিন সাঈদের সাথে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের (রাঃ) কন্যা জামিলার বিবাহ হয়েছিল হযরত হানযালার (রাঃ) সঙ্গে। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর শাহাদাত লাভের পর হযরত সাবেত বিন কায়েস তাকে বিবাহ করেন। হযরত সাবেতের (রাঃ) ইনতিকালের পর মালেক বিন দুখশাম এবং শেষে হাবিব বিন লিয়াফ তাকে বিবাহ করেন।

আসমা বিনতে উমায়েসের প্রথম বিবাহ হয়রত আলীর ভাই হযরত জাফরের সাথে হয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকে বিবাহ করেন। আর সর্বশেষে হযরত আলী (রাঃ) তাকে বিবাহ করেন।

হযরত আলীর (রাঃ) কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে। হযরত ওমরের (রাঃ) শাহাদাতের পর আওন বিন জাফরের সাথে তার বিবাহ হয়। আর আওনের ইন্তেকালের পর তার ভাই আবদুল্লাহ তাকে বিবাহ করেন।[১]

১. তাবাকাতে ইবনে সাদ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ মোটেই দোষণীয় ছিল না। যেমনটি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই তৎকালে নারীদের একাধিক বিবাহ হয়েছে ব্যাপকহারে। এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো। অন্যথায় এ ধরনের ঘটনা এত অধিক যে, এ স্বল্প পরিসরে তার ব্যাখ্যা দেয়াও অসম্ভব। [১]

## অনৈসলামিক আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদ

একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে,অনৈসলামিক আদালতে অমুসলমান জজের ডিক্রিতে মুসলমানদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। এ অধিকার ইসলাম কোন অমুসলমান আদালত তথা অমুসলমান হাকিমকে দেয় না। এমতাবস্থায় যে সমস্ত মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদের সরকারী ডিক্রি বা সরকারী তালাককে যথেষ্ট মনে করেন তারা ভুল মনে করেন। এ ধরনের পাত্রীর অন্যত্র বিবাহ প্রদান বা এর পাণিগ্রহণ স্পষ্ট ব্যভিচার ও পরস্ত্রী ধর্ষণ বা পরপুরুষের সাথে অবৈধ মিলন– এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, এমতাবস্থায় শরীয়তের আইন মোতাবেক পূর্ব বিবাহ অবিচ্ছিন্ন। তবে যদি অমুসলমান আদালতে (বা মুসলমান আদালতে) নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুসলমান বিচারক অথবা আইনত অধিকারপ্রাপ্ত অফিসার ইসলামী আইন মোতাবেক বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ডিক্রি দান করেন তবে তা হবে গ্রহণযোগ্য।

## একাধিক বিবাহের নেতিবাচক প্রভাব

এ কথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একাধিক স্ত্রীগ্রহণ ইসলামের নির্দেশ নয়, এটি ফরজও নয়, নয় ওয়াজিব ও সুন্নত। বরং এটি বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি বৈধ ব্যবস্থা মাত্র। তবে এর কিছু নেতিবাচক প্রভাব এমন রয়েছে যা পারিবারিক জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ।

একাধিক স্ত্রী হলে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, আর ঝগড়া-ফ্যাসাদ অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি স্বামী স্বাভাবিকভাবেই যখন কোন এক স্ত্রীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে জ্বলে উঠে হিংসার আগুন। এ আগুন নেভাতেই স্বামীর জীবন তরণী হয়ে উঠে ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ, মরণাপন্ন।

ক্রমে ক্রমে হিংসার এ আগুন ও ঝগড়া-বিবাদ শুধু স্ত্রীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি সংক্রমিত হয় পরিবারের সন্তানদের মাঝে। ফলে পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হয় মারাত্মকভাবে। পুত্র-কন্যারাও বঞ্চিত হয় আদর-সোহাগ- মায়া- মমতা থেকে।

১. عورت اسلامی معاشرے میں

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, স্বামীগৃহে নতুন স্ত্রী আগমনের দরুন যখন প্রথমা স্ত্রী উপেক্ষিত হয়। তার প্রতি স্বামীর মনযোগ ব্যাহত হয়। কিংবা স্বামী স্বাভাবিকভাবেই প্রথম স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নজর সরিয়ে ফেলে, তখন সঙ্গত কারণেই প্রথম স্ত্রী তা বরদাশ্‌ত করতে পারে না। এবং এ ক্ষেত্রে সে হয়ে উঠে প্রতিহিংসা পরায়ণ। যে কোন উপায়ে সতীন ও তার স্বামীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির সর্বাত্মক অপপ্রয়াস চালাতে সে অগ্রসর হতে থাকে।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এ সকল নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও যেহেতু ক্ষেত্র বিশেষে তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাই ইসলামী শরীয়ত এর অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করা, এটি ওয়াজিব। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে এবং সে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করে না এবং ইনসাফ কায়েম করে না। কেয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ হয়ে উঠবে।[১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও সফরের ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো, তিনি তাকে নিয়ে সফরে যেতেন।[২]

বস্তুত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় বিবাহ মোটেই সংগত নয়।

কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা একাধিক বিবাহের অনুমতি দানের পর এ আশঙ্কার কথাই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ঃ فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ـ

"একাধিক বিবাহ করে ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, তবে একজন নিয়েই তৃপ্ত থেকো।"

এ আয়াতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে এতে একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতা ও ইনসাফ কায়েম করতে না পারার বাস্তব দিকটির প্রতিই জোরালোভাবে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। সুতরাং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করাই উত্তম।[৩]

## একাধিক বিবাহ সংক্রান্ত মাসআলা

বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহ না করাই উত্তম। তবে যদি কেউ ইনসাফ কায়েমের আশা রাখে এবং এর সাথে সাথে প্রথম স্ত্রী দুঃখ পাবে ভেবে দ্বিতীয়

১. তিরমিযী শরীফ
২. মিশকাত শরীফ
৩. ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত।

বিবাহের আশা পরিত্যাগ করে, তবে এতে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের আশাই না থাকে তবে এতে সে গুনাহের ভাগী হবে।[১]

আসলে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করার ব্যাপারটি রাষ্ট্র পরিচালনার চাইতেও কঠিন। কারণ প্রচলিত আইন-সংবিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে রাষ্ট্র। অপরদিকে স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারটি হচ্ছে হৃদয়কেন্দ্রিক। এটি দেশ পরিচালনার চেয়ে কঠিন ও নাযুক।[২]

## একাধিক বিবাহ ঃ অনুমতি দানের মহৎ উদ্দেশ্য

কোন বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী ব্যক্তির জন্য একাধিক বিবাহের অনুমতি দানের পেছনে ইসলামের মহত্তম উদ্দেশ্যটি খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। একটু চিন্তা করলেই এর অপরিহার্যতা ও অনুমতি দানের বিষয়টি বোধগম্য হতে পারে। আমরা নিম্নে কয়েকটি বাস্তব কারণ তুলে ধরছি ঃ

১. সন্তান কামনা মানুষের স্বাভাকি প্রবণতা। বিয়ের পর প্রত্যেক পুরুষই পিতা হবার বাসনা পোষণ করে। কিন্তু বিয়ের পর যদি সে জানতে পারে যে, তার স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম, তখন সে কি সন্তান আশা পরিত্যাগ করবে নাকি বিকল্প কোন পথ খুঁজবে? ইসলাম এ ক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেয়।

২. আল্লাহ না করুন স্ত্রী যদি এমন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যার কারণে তার স্ত্রীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন স্বামীর কী করণীয়?

পাশ্চাত্যে যৌনবিলাসী গোষ্ঠী হয়ত এর জবাবে বলতে পারে – এ অবস্থায় বিয়ে ছাড়াই তো পরনারীর সাথে সে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। কারণ, তারা ব্যভিচারকে কোন রকমের অপরাধ বলে মনে করে না। কিন্তু ইসলাম তো সুন্দর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আদর্শসমাজ গঠনের পক্ষপাতী। তাই অবৈধ, লজ্জাকর এবং কোন রকমের নোংরামীপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে যৌননোংরামী ও ব্যাভিচারের মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সে দূরারোগ্য স্ত্রীর স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়েছে।

বস্তুত সামাজিক অবক্ষয় রোধে এবং নারী পুরুষের পবিত্র ও সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য বিয়ের চাইতে উত্তম আর কোন পন্থা নেই। এটিই তাই

---

১. ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত

২. নুকুশ অ তাআছ ছুরাত

অবলম্বন করা উচিত। অবশ্য কেউ কেউ মনে করে যে, দ্বিতীয় বিবাহ প্রথম স্ত্রীর উপর এক অস্বাভাবিক বোঝা। কিন্তু যারা এ কথা বলেন, তারা এ প্রশ্নের কি জবাব দেবেন যে, বন্ধ্যা ও দূরারোগ্য রোগিনী স্ত্রীর স্বামীরা কোন্ স্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করবে?

৩. কোন কোন মহিলা এমনও হয়ে থাকে যারা প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের সংস্পর্শ পছন্দ করে না। স্বামী যতই চেষ্টা ও আবেগ প্রকাশ করুক না কেন এ ধরনের নারীরা কোনক্রমেই যৌন আবেগ-আহবান অনুভব করে না। ফলে স্বামী স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আসলে এটা হচ্ছে একধরনের স্ত্রীরোগ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের স্ত্রীরোগ বেশ পরিলক্ষিত হয়। এভাবে আরো অনিবার্য কারণ থাকতে পারে যেখানে কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

৪. প্রাচীনকাল থেকে আজকের এই দিনটি পর্যন্ত জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ চলে আসছে। এই যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে রণাঙ্গণে শত্রুর মোকাবেলার জন্য, এর পেছনে জাতীয় অর্থনীতির গতিকে অব্যাহত রাখার জন্য সক্ষম লোকের প্রয়োজন যে কত অধিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য যে, একাধিক বিয়ের কারণে প্রথম যুগের মুসলমানরা বিস্ময়কর উন্নতি অর্জন করেছিলেন। তাদের জনশক্তি সুসংগঠিত ছিল বলে একদিকে তারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেন, আর অন্যদিকে শত্রু হামলার মোকাবেলা করে শত্রুকে করেন পরাস্ত। দেশের পর দেশ তাদের করায়াত্ত হয়। সে যুগে কখনো কোন ক্ষেত্রে সক্ষম লোকের অভাব দেখা দেয়নি। তখন মুসলমানদের জনসংখ্যা ছিল যেমন পর্যাপ্ত তেমনি তারা সবাই ছিল সংগঠিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

বিংশ শতকের জার্মানীর দৃষ্টান্ত তো আমাদের সামনেই আছে। জার্মানীতে একের পর এক যুদ্ধের পরিণতিতে যুবক শ্রেণীর এক বিরাট অংশ নিহত হলে হিটলারের টনক নড়ে উঠে। সে তখন এ কথা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, যুদ্ধে যে বিপুল সংখ্যক লোক মারা গেছে তাতে জার্মানি জাতির অস্তিত্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আর এই সমস্যার সমাধানে জার্মান জাতির একাধিক বিবাহ ছাড়া অন্য কোন বৈধ বিকল্প পথ নেই। ১৯৬০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মিশরীয় দৈনিক পত্রিকা আল-আহরামে হিটলারের উপ-প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বোরম্যানের ১৯৪৪ সালে লিখিত একটি প্রামাণ্য পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে জার্মান উপ-প্রধানমন্ত্রী লিখেন যে, হিটলার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবছিলেন যে, জার্মান জাতির ভবিষ্যত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জার্মানীর প্রতিটি পুরুষকে আইনগতভাবে দু'টি বিয়ে করার জন্য বাধ্য করা জরুরী।

এ ছাড়া এর আরেকটি বাস্তব দিক হচ্ছে এই যে, মহিলাদের তুলনায় যদি পুরুষের সংখ্যা কমে যায়, তাহলে এক মারাত্মক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সমাজে বিবাহযোগ্য মেয়েদের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে তখন একজন পুরুষ যদি কেবল একটিমাত্র বিয়ে করে, তাহলে অন্যান্য অবশিষ্ট বিবাহযোগ্য মেয়েদের কি অবস্থা দাঁড়াবে? বলা বাহুল্য সমাজ যদি তাদের স্বাভাবিক দাবী পূরণের বৈধ পথ না ছেড়ে দেয়, তাহলে তারা বিপথগামী হতে বাধ্য হবে। যুবতী মেয়েরা শুধু খেয়ে পরেই তো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা পূরণও জরুরী।

আসলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইনগত অনুমতি আপত্তিকর কিছু নয়। বরং তার অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগটাই আপত্তিকর যা ভোগবাদী মানুষ নিছক যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে অবলম্বন করে থাকে। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজে খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তি করাটাই হলো মূলকথা। সেখানে বিয়ের স্বাভাবিক ব্যবস্থা অবহেলিত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ব্যভিচারী বলে সেখানে তালাকের অপব্যবহার হয়ে আসছে। যৌন সম্ভোগই হচ্ছে তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারের ফলে সমাজের কি ক্ষতি হচ্ছে তা ভেবে দেখার তাদের অবকাশ নেই। মোটকথা, যৌন স্বার্থ ছাড়া পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের অন্য কোন রকম মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই।

এই পাপাচারের অবসান ও সমাজ সংস্কার কেবল আল্লাহ নির্দেশিত স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে পারে– যাতে করে কেউ বিনা কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করে। এবং শুধু যাতে অনিবার্য কারণবশতঃ মানুষ একাধিক বিয়ের অনুমতি থেকে উপকৃত হতে পারে।

এভাবে যদি ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ সর্বত্র দেখা দেয় তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বীদের উপরও ইসলামের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে প্রত্যেকের সামনেই প্রমাণিত হয়ে যাবে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের মাহাত্ম্য- শ্রেষ্ঠত্ব।

## তালাক ঃ বিভিন্ন ধর্মে

স্বভাব-ধর্ম ইসলাম কোন বিষয়েই চরমপন্থা অবলম্বন করে না। বিবাহের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দাম্পত্য জীবনে নর-নারী যত অতিষ্ঠ হয়ে উঠুক না কেন, বিবাহ বিচ্ছেদ যতই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাক না কেন, কোন মতেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না– এমন কথা ইসলাম বলে না। আবার

প্রয়োজনে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আছে বলে ডিভোর্স বা তালাকের অবাধ প্রচলন ও তালাক সংক্রান্ত অধিকারের যথেচ্ছ প্রয়োগের ফতোয়াও তেমনি দেয় না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক যত অপ্রিয় অবাঞ্ছিত হোক না কেন, মানব জীবনে এমনও অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন সেই অপ্রিয় কর্মটি ব্যতিত তার গত্যন্তর থাকে না। এ ধররে অনিবার্য পরিস্থিতিতেও যদি স্বামী-স্ত্রীর মুক্তি এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পথ চিররুদ্ধ থাকে, তবে দাম্পত্য বন্ধনের মর্যাদাই ক্ষুণ্ন হবে। ব্যর্থ হবে বিবাহের মহান উদ্দেশ্য। ফলে বিবাহরে মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ন হবে তেমনি অনিশ্চিত পরিণতির ভয়ে মানুষের মনে বিবাহ বিমুখতা দেখা দেবে। বিবাহ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। এবং জানা কথা যে, এতে দম্পতিরও শান্তি নেই, সমাজেরও কল্যাণ নেই। বরং বিচ্ছেদের আশঙ্কা, সম্ভাবনা যে মিলন মুহূর্তকে মধুর করে তোলে– এ কথা তো বলাই বাহুল্য। বরং এহেন অবস্থায় নিজ ভূল-ক্রুটি ও যথেচ্ছাচারের ফলে দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্যের সৃষ্টি এবং বিবাহ বিচ্ছেদজনিত অশুভ পরিণতির হাত থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে স্বামী-স্ত্রী সর্বদাই আত্মসতর্ক থাকবে– এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই তালাক ব্যবস্থা শত অপ্রিয় হলেও এর একটি গুরুত্ব আছে। দাম্পত্য জীবনে শান্তি এবং মাধুর্য আনয়নে এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

## হিন্দু ধর্ম

এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মে একমাত্র মৃত্যু ব্যতিত বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের অন্য কোন পথ নেই। এমন কি এ ধর্মে মৃত্যুতেও বিয়ের বন্ধন ছিন্ন হয় না। স্বামী মরে গেলেও স্ত্রীর মুক্তি নেই বলেই হিন্দু ধর্মে বিধবা বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ এবং এজন্যই প্রাচীন ভারতের বহু সতীসাধ্বী নারী সহমরণ বরণ করে নিত। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, সাম্প্রতিক কালে হিন্দু ধর্মের শিক্ষিতসমাজ এহেন অমানবিক কর্মকাণ্ডের অশুভ পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

বর্তমান বিশ্বসভ্যতাও তালাকের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে আজ বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদে বা তালাক প্রথা অনুমোদিত ও তৎসক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ইসলাম চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছেদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

## ইহুদী ধর্ম

ইহুদী ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এর জন্য পুরুষের ইচ্ছাই ছিল যথেষ্ট। তালাক প্রথা তাদের কাছে মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। পুরুষের দোষ-ক্রটি যতই থাকুক না কেন, তার বন্ধন থেকে নারীর মুক্তির পথ চিররুদ্ধ। আবার বিনা অপরাধে স্ত্রীকে তালাক প্রদান তাদের নিকট বিন্দুমাত্র নিন্দার কারণ নয়। রমণীর মর্যাদা ইহুদীধর্মে কতটুকু–তা এথেকেই সহজে বোধগম্য হয়।

## খ্রিস্ট ধর্ম

খ্রিস্ট জগতে প্রথমদিকে তালাকের কোন অবকাশই ছিল না। যে কোন পরিস্থিতিই বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল চিরনিষিদ্ধ। হিন্দু ধর্মের মতই খ্রিস্ট জগতে এই অবৈজ্ঞানিক, অস্বাভাবিক নীতি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অস্বাভাবিকতা এহেন নীতির অসারতা-অকল্যাণ প্রমাণ করে দিয়েছে সকলের কাছে। ফলে এই অনিবার্য পরিণতিতে আন্দোলন শুরু হয়। সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এতে উল্লেখযোগ্য জনকল্যাণ সাধিত হয়নি। বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আইনত স্বীকৃত হলেও বিচ্ছিন্ন স্বামী স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহের পথটি রুদ্ধ থেকে যায়।

১৯১০ সালে এ বিষয়ে এক কমিশন গঠিত হয়। এবং ১৯২০ সালে উক্ত কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ ও অন্যত্র বিবাহের অধিকার প্রদত্ত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান মাত্রই পাশ্চাত্যে তালাকের ধুম পড়ে যায়। সীন আদালতে একই তারিখে দু'শত চুরানব্বুইটি তালাকের ডিক্রি প্রদত্ত হয়। ইল্যাণ্ডের একই আদালতে একই তারিখে চার হাজার একশত নয়টি তালাকের আবেদন পেশ হয়েছিল। বিভিন্ন বৎসরে ক্রমশ তালাকের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২২ সাল থেকে সেখানে প্রতি দু'টি বিবাহে একটি তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

যারা পর্দা প্রথাকে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির অন্তরায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন, তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, একবার পশ্চিমা দুনিয়ার দাম্পত্য ব্যর্থতা তথা বিবাহ বিচ্ছেদের করুণ দৃশ্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন।

বস্তুত ইসলাম তালাক প্রথা অনুমোদন করলেও এর যথেচ্ছ ব্যবহারকে মোটেই পছন্দ করে না। পারতপক্ষে তালাক পরিহার করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। সে সূচনাতেই ঘোষণা দিয়েছে, বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে সর্পাপেক্ষা অপ্রিয় বিষয় আল্লাহর নিকট তালাক।'

এ পর্যায়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তালাকের মান ও তার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে পৃথক আলোচনা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। নিম্নে তার কিছুটা বিবরণ তুলে ধরা হলো।

## তালাক অপছন্দনীয়

তালাকের সরল অর্থ হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া। এবং তারা আল্লাহর আইন মোতাবেক পরস্পর যে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা নাকচ করে দেওয়া।

মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর আইন নাকচ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মধ্যস্থতাকে ভঙ্গ করা। যারা এমন করে তারা নিজেরাই নিজেদের ভালবাসা ও শান্তির অবসান ঘটায়। কোন রকমের অপরিহার্য কারণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা মূলত আল্লাহর আইনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমার সাথে খেলা করছো, কখনো বল যে তালাক দিয়েছি, আবার কখনো (তা) ফিরিয়ে নাও।"[১]

আল্লাহর কিতাবের সাথে কি খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।[২]

এ সকল বাক্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, যে তার স্ত্রীকে বিনা কারণে তালাক দিয়েছিল। অথচ ইসলামী শরীয়ত একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিয়ে থাকে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের চরম অবনতিশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে– যখন একত্রে দাম্পত্য জীবন যাপনের অন্য কোন বিকল্প পন্থাই অবশিষ্ট থাকে না – ঠিক তখনই স্বামীকে এই শেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাইতো তালাকের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"আল্লাহর কাছে হালাল বিষয়াবলীর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় হচ্ছে তালাক।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তালাকের চেয়ে বেশি নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই সৃষ্টি করেননি।[১]

১. ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান
২. নাসায়ী শরীফ
৩. আবু দাউদ

হযরত আলী (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ তালাক এমন বিষয় যার কারণে আরশও নড়ে ওঠে।[৩]

## তালাকই মুক্তির একমাত্র পথ নয়

হতে পারে কোন নারীর মাঝে পাওয়া যেতে পারে কিছু অপছন্দনীয় বিষয়। কিন্তু এর প্রতিকারের পথ তালাক নয়। ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের ছোটখাট খুঁতগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুক। এবং সুন্দর ও স্বস্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করুক। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীর সাধারণ ভুল-ক্রটি ক্ষমা করার সুপারিশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুলনামূলক উদাহরণের মাধ্যমে নারীপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন,

"নারী পাঁজরের হাড়ের মত বাঁকা, যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে সে ভেঙে যাবে। আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে তাদের বক্রতা সত্ত্বেও তোমরা তাদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারবে।"[৩]

উক্ত হাদিসের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথাই সহজে বোঝা যায় যে, এতে পুরুষকে নারীর সাধারণ ভুল-ভ্রান্তির প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেবার কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি ক্ষমা-ঔদার্যই যে মহৎ ও সুখী জীবনের চাবিকাঠি, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ হাদিস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের পরিবর্তে নারীদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাক, তাহলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু নারীর প্রতি এই সহানুভূতি-ঔদার্য প্রদর্শনের অর্থ এ নয় যে, ইসলাম নারীকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিংবা নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত আচার-আচরণের সুযোগ দিচ্ছে অথবা নারীকে নানা অপরাধের উৎস মনে করছে।

আসলে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরুষের মাঝে এই বোধ-চেতনা সৃষ্টি করা যে, ঘটনাচক্রে নারীর মধ্যে যদি কোন দোষ-ক্রটি দেখা দেয় তাহলে তাকে পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়া না করা হয়। কারণ হতে পারে– একদিকে তার কোন খুঁত থাকলেও অপরদিকে হয়তো তার সদগুণ বিদ্যমান থাকতে পারে– যা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক। কারণ দোষ-গুণ নিয়েই তো মানুষ। আর নারী মানুষ বৈ তো অন্য কিছু নয়। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

১. দারা কুতনী
২. দায়লামী
৩. বোখারী, মুসলিম শরীফ

"কোন মোমেন পুরুষ যেন কোন মোমেনা নারীকে ঘৃণা না করে। কেননা তার কোন কর্ম অপছন্দ হলেও অন্য কোন কর্ম পছন্দনীয় হতে পারে।[১]

মূলত ইসলাম কীভাবে মুসলমানকে তালাকের অপব্যবহার ও তার নিন্দনীয় পন্থা থেকে বিরত রাখতে চায়– তা এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। যদি স্ত্রীর কোন দোষ-ত্রুটি থেকেই থাকে তবে এক্ষেত্রে পুরুষকে সমঝোতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ সকল পরিস্থিতি ইসলাম কেবল পুরুষকে এ পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাকে স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহারেরও নির্দেশ দিচ্ছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

"তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ১৯)

এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে আল্লামা আবু বকর জাস্সাস তাঁর তাফসিরে আহকামুল কুরআনে বলেন, 'এই আয়াত এ কথাই প্রমাণিত করে যে, ইসলামী শরীয়ত স্বামীর অপছন্দ সত্ত্বেও স্ত্রীর সদ্ভাব বজায় রাখার উপদেশ দেয়। কারণ আল্লাহ্ তাআলা এর মাধ্যমে আমাদের এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, তাতে তিনি বিরাট কল্যাণ রেখেছেন।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সত্যিকারভাবে কোন এমন অপ্রিয় কর্মে অভ্যস্থ হয়ে থাকে যা বাস্তবে দাম্পত্য জীবনকে করে তোলে কলুষিত। বিনষ্ট করে দেয় স্বামীর স্বস্তি ও শান্তি। এবং যদি এ ক্ষেত্রে কোন আলাপ-সমঝোতা, প্রীতি-ভালবাসা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির পরও স্ত্রী তার ক্ষতিকারক বদ আচার-আরচণ পরিত্যাগ না করে থাকে, তবে ইসলাম একেবারে শেষ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এ দাম্পত্যনীড় ভেঙে দেবার অনুমতি দেয়। কিন্তু এ অবনতিশীল নাযুক পরিস্থিতিতেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্ক উপদেশ ঃ

"নারীদেরকে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তালাক দিওনা। কারণ আল্লাহ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারিণীদের ভালবাসেন না"।[২]

আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থেক দিক থেকেই হাদিসের যে সারমর্ম দাঁড়ায় তা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকের বিকল্প ব্যবস্থা বর্তমান, ততক্ষণ পর্যন্ত নারীদের তালাক দিও না। বস্তুত তালাক হচ্ছে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থার শেষ কেন্দ্র।

১. মুসলিম শরীফ
২. তাবরানী

## ঋতুকালে তালাক প্রদান নিষিদ্ধ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দেন। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, আবদুল্লাহ যেন তার স্ত্রীকে (স্ত্রীত্বে) ফিরিয়ে নেয় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখে। তারপর আবার (যখন) ঋতুস্রাব হবে এবং তা শেষ হয়ে স্ত্রী পবিত্র হয়ে উঠবে তখন যদি স্বামী তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করে তবে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেবে। এটাই হচ্ছে সেই ইদ্দত যার মধ্যে আল্লাহ তালাকের বিধান রেখেছেন।"[১]

এই হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রোধ– এ কথাই প্রমাণ করছে যে, ঋতুকালে তালাক প্রদান হারাম। (কিন্তু তা সত্ত্বেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে) বস্তুত ঋতুকালে সাধারণত স্ত্রীর প্রতি যৌন আকর্ষণ হ্রাস পায়। তাই যথার্থ কারণ না থাকলেও পুরুষের পক্ষ থেকে এসময় তালাক দেবার প্রবণতা প্রকাশ পায়। এজন্য ঋতু অবস্থায় তালাক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তুহর বা পবিত্র অবস্থায় স্ত্রীর প্রতি যেহেতু স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়– এমন পরিস্থিতিতে তালাক প্রদান করতে চাইলে স্বভাবত এ কথাই বোঝা যাবে যে, এতে স্বামীর পক্ষ হতে নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসংগত কার্যকারণ রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে সে তালাক দিতে চাইছে।

## তালাকের শিষ্টাচার

১. যে তুহরে স্ত্রীসহবাস হয়নি এমন তুহরে এক তালাক দেওয়ার পর তার ইদ্দত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাকে বর্জন করা। এটি তালাকে হাসান বা উত্তম তালাক বলা হয়।

২. সহবাস মুক্ত পৃথক পৃথক তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান। এটি তালাকে আহসান বা অতিউত্তম তালাক বলা হয়।

অনেক অজ্ঞ স্বামী চিন্তা-ভাবনা না করেই এক সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে, এটি নির্বুদ্ধিতা। তালাক দিয়ে পরবর্তী সময়ে অনুশোচনায় লিপ্ত হয়। আলেমদের কাছে এসে সত্য গোপন করে নিজেও গোনাহগার হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু অর্থলোলুপ মৌলভীদেরকে গুনাহের পথে টেনে আনে।

কখনো মৌলভী সাহেবের কাছে এসে বলে– হুজুর! আমার তালাকের নিয়ত ছিল না। আবার কখনো বলে– হুজুর! রাগের মাথায় তালাক দিয়েছি। কখনো

১. বোখারী ও মুসলিম শরীফ

বলে, তালাকের সময় তার নাম নিইনি। মোটকথা এ সবই হচ্ছে শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার অনিবার্য পরিণতি। শরীয়ত সম্মত তালাক প্রদান করলে হতাশাগ্রস্ত হবার কোন কারণই দেখা দেয় না।

## তালাকের প্রকার

ফোকাহায়ে কেরাম তালাকের তিনটি প্রকার উল্লেখ করেছেন ঃ

**১. তালাকে রজয়ী ঃ** স্বামী স্ত্রীকে একবার বা দু'বার বললো, তুমি তালাক। অথবা বলল, তুমি এক তালাক বা দু'তালাক। এ ধরনের তালাকের পর পুনরায় তাকে নতুন বিবাহ বন্ধন ছাড়াই স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হল, স্বামী স্ত্রীকে বলবে,আমি তোমাকে যে তালাক প্রদান করেছি তা প্রত্যাহার করছি, অথবা কোন কিছু না বলে তার সাথে সহবাস করল অথবা সহবাসের নিয়তে তাকে স্পর্শ করলো। স্বামীর এ সকল আচরণের মাধ্যমে নতুন বিবাহ ব্যতিতই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল হয়ে যাবে।

**২. তালাকে বায়েন ঃ** এই তালাক কোন্ কোন্ শব্দযোগে পতিত হয় তা ফেকার কিতাবসমূহে কিংবা কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট থেকে জানা যেতে পারে। এই তালাকের কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব এক্ষেত্রে নতুনভাবে বিবাহ করে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।

**৩. তালাকে মুগাল্লাজা ঃ** এর অর্থ হচ্ছে, একত্রে তিন তালাক প্রদান, অথবা পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক প্রদান। এক্ষেত্রে তালাকের পর হালালা ব্যতিত সেই স্ত্রীলোককে বিবাহ করা জায়েয নেই। অর্থাৎ তালাকের পর ইদ্দত শেষ হলে অন্য কারো সাথে বিবাহ হওয়ার পর এবং সহবাসের পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে ইদ্দতান্তে পূর্বের স্বামী তাকে বিবাহ করার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য যে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয়ে থাকে। এভাবে জবরদস্তিমূলক ভাবে কিংবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক প্রদান করলেও তা কার্যকর হয়ে যায়। তবে নাবালেগ, পাগল কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক গ্রহণযোগ্য নয়।

## নিয়ত ছাড়াও তালাক কার্যকর হয়

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় হাস্য-কৌতুকের মধ্য দিয়েও বাস্তবায়িত হয়ে যায়। এ তিনটি বিষয় হচ্ছে ঃ বিবাহ, তালাক ও রাজআত তথা তালাক প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করা।"[১]

১. তিরমিযী শরীফ

অর্থাৎ কেউ যদি হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়ে বিবাহ করে ফেলে অথবা আপন স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে কিংবা তালাক প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করে, তবে এসব কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হয়ে যায়। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এসবের কোন কিছুরই নিয়ত ছিল না।

অন্য আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,তিন ধরনের মানুষের উপর হতে লেখনী উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাদের আমল লিপিবদ্ধ হয় না। এরা হচ্ছে ঃ

১. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত।

২. নাবালেক বালেগ হওয়া পর্যন্ত।

৩. বুদ্ধি-বিবেকহীন ব্যক্তি বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।"[১]

অর্থাৎ এই তিন শ্রেণীর মানুষের অন্যান্য কাজ কর্ম যেভাবে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় ঠিক এমনিভাবে এদের তালাকও গ্রহণযোগ্য নয়।

## ইদ্দত

বিবাহ বিচ্ছেদের সাথে সাথে অথবা স্বামীর ইন্তেকালের পরমুহূর্তেই অন্যত্র বিবাহ করার দরুন বৈবাহিক মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ন হয়, তেমনি পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তান সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের পূর্বেই অন্যত্র বিবাহের মধ্য দিয়ে সন্তানের প্রকৃত জনক সম্পর্কে একটি অনিশ্চয়তার চির-আবরণ থেকে যায়। আজ এর কাছে কাল ওর কাছে– এতে নারীর মর্যাদা হ্রাস পায়। এহেন অশোভনীয় এবং কলঙ্কজনক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলার জন্য ইসলাম প্রবর্তিত কল্যাণকর ব্যবস্থার নাম ইদ্দত। বিবাহ বিচ্ছিন্ন বিধবা স্ত্রী যেমন তিন মাস বা গর্ভবতী হলে বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা উভয় রমণীই সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না। করলেও সে বিবাহ বিবাহ না হয়ে ব্যভিচার বলে গণ্য হয়।

তেমনি পুরুষও এক বোন তালাক দিয়ে তারই সহোদরাকে পরমুহূর্তেই বিবাহ করবে, কিংবা চতুর্থা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তিনজন স্ত্রীর বর্তমানে পরমুহূর্তেই চতুর্থ বিবাহ করবে– এমন অধিকার ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না। উল্লেখিত সময়টুকু অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন চতুর্থ বিবাহ কিংবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সহোদরাকে বিবাহের অধিকার পুরুষের নেই, তেমনি

১. তিরমিযী শরীফ

উপরে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট অবস্থা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহের অধিকার নারীরও নেই। তবে যেহেতু নারীকে গর্ভধারণ করতে হয়, সন্তান সম্ভাবনার নিশ্চয়তা প্রদানে তারই দায়িত্ব বেশি, তাই ইদ্দতের গুরুত্ব তার বেলায় অপেক্ষাকৃত বেশি।

মূলত বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা বৈধব্যের পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের পূর্বে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিগত বিচ্ছেদজনিত অনুতাপ-অনশোচনার ধাক্কা সামলে নেবার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। ইসলামের ইদ্দত ব্যবস্থার মূলে এটিও এক অন্যতম উদ্দেশ্য।

## আকিকা

নিজ সন্তানসন্ততির আকিকা করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। নিম্নে আকিকার সংক্ষিপ্ত কিছু ফযিলত এবং মর্যাদা উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

### আকিকার ফযিলত ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ছেলের পক্ষ থেকে দু'টি বকরি আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি খাসী আকিকা করা উত্তম।[১]

সালমান ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তার পক্ষ থেকে আকিকা করা উচিত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর অর্থাৎ জবাই কর এবং পঙ্কিলতামুক্ত কর।[২]

হযরত সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিটি সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে একটি বন্ধকী বস্তুর ন্যায়, (অর্থাৎ আকিকা যথাসম্ভব অবশ্যই করা চাই) যা তার সপ্তম দিনে জবাই করা হবে এবং সেদিন তার নাম রাখা কর্তব্য। সেদিনই তার মাথাও কামানো হবে।৩

### আকিকা করা সুন্নত' মুস্তাহাব

**মাসআলা ঃ** কারো ছেলে কিংবা মেয়ে জন্ম নেবার সপ্তম দিনে তার নাম রাখা এবং আকিকা করা উত্তম। সপ্তম দিনে আকিকা করা সম্ভব না হলে সপ্তম দিবসটি স্মরণ রাখা চাই। অর্থাৎ তারপর যখনই কেউ আকিকা করুক না কেন, যে বারে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তার পূর্বের দিন আকিকা করা জরুরী হবে। যেমন, সন্তানের জন্ম শুক্রবারে হয়ে থাকলে বৃহস্পতিবার সপ্তম দিবস হিসাবে গণ্য হবে। সেদিন আকিকা করা কর্তব্য। বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করলে বুধবারে আকিকা করা জরুরী।

১. ইবনে মাজাহ
২. ইবনে মাজাহ
৩. ইবনে মাজাহ

**মাসআলা ঃ** ছেলে হলে আকিকার দু'টি বকরি বা দু'টি ভেড়া আর মেয়ে হলে একটি বকরি বা একটি ভেড়া জবাই করা চাই।

কোরবানির গরুতেও আকিকার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে আকিকার জন্য গরুতে ছেলের পক্ষ থেকে দু'অংশ আর মেয়ের পক্ষ থেকে এক অংশ নির্ধারণ আবশ্যক।

**মাসআলা ঃ** যে সকল পশুর কোরবানি জায়েয নেই, সেসব পশুর আকিকাও জায়েয নেই। আর যেসব পশুর কোরবানি জায়েয, সেসব পশুর আকিকাও জায়েয।

**মাসআলা ঃ** আকিকার কাঁচা গোশত ভাগ-বন্টন করে দেওয়া কিংবা রান্না করে বন্টন করা বা দাওয়াত করে খাওয়ানো– সবই জায়েয।

**মাসআলা ঃ** আকিকার গোশ্ত পিতামাতা , দাদা-দাদী ও নান-নানী সকলেই খেতে পারে।

## কুসংস্কার

সাধারণভাবে এ প্রথা আছে যে, ঠিক যে সময় সন্তানের মাথায় ক্ষুর রাখা হয় কিংবা তার চুল কাটা শুরু করা হয়, তখন পশু জবাই করা জরুরী। আসলে এ হচ্ছে কুসংস্কার। মাথা মুণ্ডানোর পরে বা পূর্বে– যখনই আকিকা করা হোক না কেন শরীয়তে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং এ ধরনের কুপ্রথা অনুসন্ধান করে তা পালন করা কঠিন গুনাহের কাজ।

**মাসআলা ঃ** অনেকেরই ধারণা, আকিকার পশুর হাড় ভাঙা যবে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এ ছাড়া আকিকার পশুর মাথা কসাইকে দেওয়াও ওয়াজিব নয়। বরং কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম করে অনাবশ্যক প্রমাণ করে দেওয়া উচিত, যাতে অন্যরা এ থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

**মাসআলা ঃ** কেউ কেউ মনে করে, আকিকার গোশ্ত পিতা, দাদা, নানা-নানী খেতে পারে না। ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।[১]

## পাশ্চাত্যের চালচিত্র

### সহশিক্ষা

সহশিক্ষার চরিত্র বিধ্বংসী প্রভাব সম্পর্কে জনৈক খ্রিস্টান গ্রন্থকার লিখেছেন, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে অপরিণত বয়সের ছেলে মেয়েরাও যৌন শিক্ষা লাভ করছে। পনের বছরের বালকের স্বীকারোক্তিতে জানা গেছে, বহুদনি পূর্ব

২. নেকখাবেন্দ নেক বিবি

থেকেই সে যৌন বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে অল্প বয়সেই পতিতালয়ে গমন করে। বর্তমানে উচ্চ শ্রেণীতে বালিকাদের আগমনে অধিকাংশ বালকই পতিতাদের সংসর্গ ত্যাগ করেছে। কারণ এ বালিকা ছাত্রীরা যৌন ক্রীড়ায় পতিতাদেরকেও পরাজিত করেছে।

## জারজ সন্তান

পাশ্চাত্যে অবৈধ সন্তানদেরকে হত্যা বা বিক্রয় করা হয়। একটি শিশুকে সেখানে ১৫/২০ পাউণ্ডে কেনা যায়। ছেলেদেরকে ঘরোয়া কাজে আর মেয়েদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়। এসব মেয়েরা নির্দ্বিধায় হোটেল রেস্তোরাঁয় বসে দেহব্যবসা চালিয়ে যায়। তবে বর্তমান কোন কোন দেশ এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করছে। সম্প্রতি রুমানিয়ায় ৪০ বৎসরের কম বয়সী মেয়েদেরকে হোটেল বা রেস্তোরাঁয় পরিচর্যা কর্মে নিযুক্ত করা হবে না বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

অবৈধ সন্তান উৎপাদনের দিক দিয়ে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৬১ সালে ২০শে আগষ্ট ওয়াশিংটনের জনস্বাস্থ্য বিভাগের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, ১৯৫১ সনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজারে ৫২টি জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এ বছর অবিবাহিত মায়েরা মোট ২ লক্ষ ২১ হাজার জীবিত সন্তান প্রসব করে। পনের বছরের নিম্নবয়স্কা মায়েরা অধিক সংখ্যক সন্তান ধারণ করে। এদের জারজ সন্তানের হার প্রতি হাজারে ৬৭৯ জন।

কি ভয়াবহ চিত্র। এ হচ্ছে বিংশ শতকের মাঝা মাঝি সময়ের অবস্থা। বর্তমানে আমরা এ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। জারজ সন্তানের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান কি হতে পারে তা বোধকরি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। উপরের বর্ণনা থেকেই তা সহজেই অনুমেয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মুসলিম জাহানও আজ এই তথাকথিত সভ্য দেশের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। এদের বাহ্যিক চাকচিক্যে আত্মহারা হয়েছে।

আজ যদি আমরা ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে থাকি, তবে সেই আদর্শের প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে আজকের পাশ্চাত্য সমাজনীতি আদর্শকে। এ পর্যায়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন্ কোন্ বিষয় গ্রহণযোগ্য কিংবা পরিত্যাজ্য তা সুচিন্তিত গবেষণার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

নিউইয়র্কের শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সভাপতি মি. এলসওয়ার্থ আমেরিকান মার্কারী পত্রিকায় লিখেছেন, ১৯৩৮ সনে শুধু নিউইয়র্ক শহরেই ১৩৪৭ সদ্যোজাত জারজ সন্তানের খবর পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই ১৫ বা তার

চাইতেও নিম্নবয়স্কা কুমারী মেয়ের সন্তান। দুইজন প্রসূতির বয়স ছিল ১৩। এই জারজ সন্তানের মায়ের সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রেই প্রসূতির বয়স ১৯-এর নীচে। অনেক ক্ষেত্রে ১০/১২ বছরের মেয়েও জারজ সন্তানের মা হয়েছে। সম্প্রতি আরো কম বয়সী মেয়েরাও অবৈধ সন্তানের মা হচ্ছে সেখানে।

ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট পত্রিকায় বলা হয়েছে, ইউরোপে স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার যে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে, তার মারাত্মক পরিণতি ভোগ করবে পাশ্চাত্য সমাজ অদূর ভবিষ্যতে। কল-কারখানা, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ ও পার্কসমূহে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলাশেলা যে অনৈতিক যৌনাচারের বান ডেকে আনছে তার ফলে নীতিধর্ম, ইজ্জত-আব্রু, স্বভাব-চরিত্র এমনকি পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা সবই ভেস্তে যাওয়ার সম্মুখীন। তরুণ-তরুণীরা অবাধে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ক্রমশ বিবাহ্ বন্ধনের যৌক্তিকতা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডের আর্চ বিশপদের নৈতিক মঙ্গল সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণী থেকে দেখা যায়, ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে যে সমস্ত শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাদের প্রতি আটটির একটিই জারজ। এই রাজ্য দু'টিতে বছরে এক লক্ষ রমণী বিবাহ ছাড়াই গর্ভবতী হয়। ২০ বছরের নিম্নবয়স্কা যত মেয়ের বিয়ে হয় তাদের শতকরা ৪০ জনই বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়ে থাকে।

ডাক্তার ক্যাথারিন রেমেন্ট ডেভিস এক হাজার অবিবাহিতা মেয়েকে প্রশ্ন করেন। এরমধ্যে ৬০৩ জন নানা অস্বাভাবিক বিবিধ যৌন অভিজ্ঞতা এবং ১০৫ জন স্বাভাবিক সঙ্গম অভিজ্ঞতা লাভের কথা স্বীকার করে। ৭৩০টি মেয়ে গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি ব্যবহার করেছে বলে জানায়। ৫৩ জন কোন উত্তর দিতে রাজি হয়নি। ২৩১ জন কোন অপকর্ম করেনি বলে জানায়। এ থেকে নীরব ও অস্বীকারকারী মেয়েদের সতীসাধ্বী বলে ধরে নিলেও প্রতি দশটি মেয়ের তিনটি মাত্র মেয়ে অনাচারে লিপ্ত হয়নি বোঝা যায়। অর্থাৎ নারী প্রায় নেই বললেই চলে।

## মদ্যপান

ফ্রান্সে মদ্যপান সম্পর্কে তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শতকরা ২৩ জন ফরাসী পুরুষ এবং ৪৩ জন ফরাসী নারী পানি ব্যবহার করে থাকে। আর শতকরা ৮২ জন পুরুষ এবং ৬০ জন নারী শুধু মদ ব্যবহার করে থাকে। যারা শুধু মদ ব্যবহার করে তাদের ছাড়া কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ এমনও আছে যারা মদে পানি মিশ্রিত করে পান করে। এদের মধ্যে শতকরা ৯ জন মহিলা এবং ৪০ জন পুরুষ। কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে ঃ বিগত দশ বছরে অতি মাত্রায় মদ্য পানের কারণে মৃতের সংখ্যা বারগুণ বেড়ে গেছে।

পশ্চিম জার্মানিতে এক পানশালার মালিক প্রতি বছর তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রঙিন পানীয় বিয়ারের একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। ১৮ বয়সোর্ধ যে কোন নারী বা পুরুষের জন্য এ ঝর্ণা থেকে বিনামূল্যে মদ পান করার অবাধ দেওয়া হয়। বিগত বছরগুলোর মত এবারও তিনি মদের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলেন এবং তা এক নাগাড়ে সাত ঘন্টা পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছিল। এ ঝর্ণা থেকে প্রায় ২৫,০০০ হাজার লোক বিনামূল্যে মদ পান করে। জানা গেছে, এ উপলক্ষ্যে ডাক ও তার বিভাগ এই ঝর্ণার ছবি সম্বলিত স্মারক ডাক টিকেটও প্রকাশ করেছিল। অথচ এই মদ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মদ্যপান প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ডঃ রবাট পিরাস মন্তব্য করেন, সংঘটিত যৌন অপরাধের শতকরা ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ মদ্যপানের ফলে হয়ে থাকে।

এই মদের পেছনে শুধু বৃটেনেই বছরে সাড়ে ১৩শ কোটি টাকা খরচ হয়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সেখানকার বহু গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজেও ব্যয়িত হয় না। এ থেকেই অনুমান করা যায়, আনন্দ-ফূর্তি আর অবাধ যৌনাচার লালনের অসংখ্য উপায় উপকরণের জন্য কি পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। কোন জাতি যদি এ পরিমাণ অর্থ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ব্যয় করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে দেশ শান্তি-সুখের নীড়ে পরিণত করতে পারে।

## সতীত্বের বিকিকিনি

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে মেডিক্যাল কোর্ড সমগ্র ফ্রান্স সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন যে, সে দেশে একজনও সতীসাধ্বী নারী নেই। আর এ জন্য ফ্রান্সের মানুষ গর্বিত।

ফ্রান্সে কোন সতীসাধ্বী নারী নেই– শুধু এটাই ফ্রান্সের গর্বের বিষয় নয়। বরং তারা গর্বিতশির উঁচু রাখার নিমিত্তে আছে এক স্থায়ী শ্রেণী। যার কাজই হলো ফ্রান্সের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা।

সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক এক বিচারক মার্শাল সিকোট যিনি দশ বছর পর্যন্ত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ছিলেন সহ-সভাপতি, তিনি তার "সতীত্বের বিকিকিনি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, প্যারিসে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সতীত্ব বিক্রয়ের জন্য আট হাজার নারী তাদের হোটেল বা গৃহ থেকে বেরিয়ে আসে। এই আট হাজার মহিলার প্রতি রাত্রে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ক্রেতা জোটে। প্রত্যেক পর্যটক তাদেরকে বোটন ডি বোলনের পার্কে মাউন্ট পেসরাসের আবছা আলো এবং মাউনটেনমারেনটার প্যারিসের ওয়েষ্ট এণ্ডের উন্নত মানের হোটেলগুলোতে দেখতে পায়।

# হলিউডে নির্মিত ছবি

আমেরিকা সরকার নিজ দেশে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য এক কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিশন তার রিপোর্টে বলেছেন, যৌন অপরাধ, ধর্ষণ, অপহরণ, শত্রুতামূলক হত্যা, নোংরা রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির বড় কারণ হচ্ছে হলিউডে নির্মিত ফিল্ম। কমিশন আরো বলেন, এসব ছবির উপর যদি কড়াকড়ি আরোপ না করা হয় তবে এমন এক সময় আসবে যখন গোটা আমেরিকা গুণ্ডা, মস্তান, ব্যভিচারী এবং ডাকাত লুটেরাদের আবাসভূমিতে রূপান্তরিত হবে। কমিশন বলেছেন, এসব ছবির মাধ্যমে ডাকাতরা আমাদের যুবকদের কাছে হিরো বলে গণ্য হচ্ছে।

যুবক শ্রেণী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ডাকাতদের পোশাক-আশাকের অনুকরণ করছে। অপহরণ ধর্ষণকে পৌরুষের প্রতীক বলে মনে করছে। মেয়েরা পিতামাতাকে না জানিয়েই স্কুল থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। কমিশন এ ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃখিত যে, আমেরিকার আচার-আচরণ যা সারা দুনিয়ার জন্য অনুসরণীয় ছিল আজ তা অবনতি ও বিকৃতির চরম সীমায় পৌছে গেছে। অশ্লীলতা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আইনের সাহায্যেও তার সংশোধন অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বর্তমানে আমাদের শিশু-কিশোর যুবকরাও নানাবিধ অশ্লীলতা ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে। নানাবিধ অশ্লীল ম্যাগাজিন, যৌন সুড়সুড়িমূলক নাটক-নভেল, টিভি, ভি. সি.আর ও ডিশের কুরুচিপূর্ণ ছবি আমাদের সমাজে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এম. টিভি, মাইকেল জ্যাকসন, স্পাইস গার্লস প্রজন্ম আমাদের কিশোর যুবকদের নগ্নতা-অশ্লীলতার চরম পর্যায়ে পৌছে দিচ্ছে। বেপরোয়া চাল-চলন আর নগ্নতায় আদর্শ জাতিগঠন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। তদুপরি এসকল কর্মকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখা দিচ্ছে এইডস ও অন্যান্য যৌন রোগের সংক্রমণ।

এইডসের ভয়াবহতা এখন বিশ্বময়। শত শত মানুষ এখন বিনা চিকিৎসায় এই মরণব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। এখন পর্যন্ত এর সঠিক চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়নি। এতকিছু সত্ত্বেও মানুষ সাবধান হচ্ছে না। প্রতিদিনই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বহু মানুষ। আর সেই সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছে তারা এইডস ভাইরাস এইচ আই ভি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এজন্য অবাধ যৌনাচারকেই প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করছে।

এই প্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পবিত্র বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন, পাপ কোন একক জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে না

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজ কর্মকাণ্ড দ্বারা তার ঘোষণা না দেয়। আর ঘোষণা দিলেই মহামারী ও অন্যান্য রোগ তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না।

বস্তুত গুনাহের দরুন পৃথিবীতে নানা প্রকারের অশান্তি হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ

মানুষের কৃতকর্মের (গুনাহের) দরুন জলে-স্থলে সমস্ত স্থানে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। (সূরা রূম)

প্রাকৃতিক দূর্যোগ, রোগ-ব্যধি, শস্যাদির বরকত হ্রাস, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের গুনাহের পরিণতি। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, কোন ধরনের বিপদাপদই গুনাহ ব্যতিত নাযেল হয় না। আর বিপদাপদ তাওবা ব্যতিত কিছুতেই দূর হয় না। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, যে সকল বিপদ তোমাদের উপর আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই আসে। অথচ অনেক বিষয় খোদা তাআলা ক্ষমাও করে দেন।

কুরআন ও হাদিসের উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে, পৃথিবীর হাহাকার ও বিপর্যয়ের মূলকারণ আমাদের অপরাধ-অপকর্ম। যতদিন আমরা এই পরমসত্য হৃদয়ঙ্গম করে ভুল পথ থেকে ফিরে এসে সৎ ও সত্য পথে আসতে সক্ষম না হব, ততদিন জগতের অশান্তি কিছুতেই দূর হবে না।

## নারী স্বাধীনতা, বিজ্ঞান ও কুরআন

নারী নারীই, যেহেতু সে পুরুষ নয়, তাই তাকে সর্বাবস্থায়ই পুরুষের অনুগামী-অনুষঙ্গ হয়ে থাকতে হবে। এ হচ্ছে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের সরল বক্তব্য। এর বিপরীতে আছেন আধুনিক নারী প্রগতিতে আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা বলেন, এ নিয়মটা পুরুষের তৈরি। নারীকে তাঁবেদার রাখার, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার এক ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করেই আজ ঘোষণা করতে হবে যে, নারী-পুরুষ অভিন্ন। উভয়ের মধ্যকার যে পার্থক্য তা সামাজিক। মূলত নারী-পুরুষ সকল দিক দিয়েই সর্বস্তরে সর্বসম।

প্রাচ্যের নারী দাসী আর পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীন, এই দুই দ্বন্দ্ব যখন চরমে তখন প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনে এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞান। নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য কি শুধু সামাজিক নাকি দৈহিক, নাকি আরও গুরুতর কোন কার্যকারণ এর পেছনে নিহিত– বিজ্ঞান তার বিচার বিশ্লেষণ করেছে। বিজ্ঞানের এই গবেষণার যে ফলাফল "নিউজ উইকে' প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

আধুনিক নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মূলবক্তব্য হচ্ছে, নারী-পুরুষের আচরণ বা স্বভাবগত পার্থক্য আসলে সামাজিক ব্যবস্থারই ফলাফল। কিন্তু সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার দু'জন মনোবিজ্ঞানীর গবেষণায় দেখা গেছে, স্ত্রী হরমোন যা মূলত নারীকে দৈহিক দিক থেকে নারী হিসাবে পরিচিত করায়, সেই স্ত্রী হরমোনের মধ্যেই রয়েছে-ঐতিহ্যগত নারীসুলভ স্বভাব, নম্রতা, বিনয় ও পরনির্ভরতা। এই বিষয়টি শুধু সামাজিক আচার-আচরণে নয়, নারীর দাম্পত্য আচরণেও পরিস্ফুট বলে উক্ত দুই বিজ্ঞানী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য এই অভিমত করতে বিজ্ঞানী দু'জনকে সুদীর্ঘ গবেষণা চালাতে হয়েছে। প্রথমেই তারা বেছে নিয়েছেন আধা ডজন পুরুষ ইঁদুরকে। এসব ইঁদুরের প্রতিটাই ছিল ধাড়ি। এদের মধ্যে বড় বড় ও মাতব্বর গোছের তিনটি ইঁদুরকে বেছে নিয়ে স্ত্রী হরমোন জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা হতে থাকে, ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই তিনটি ইঁদুরের দেখা দেয় স্ত্রী ইঁদুরসুলভ নম্রতা ও বশ্যতা। সপ্তাহের শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, ঔষধমুক্ত তিনটি ইঁদুরের উপরেই ঔষধ সেবন করা ইঁদুর তিনটি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরপর বিজ্ঞানীরা ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করে দেন। মাত্র এক সপ্তাহ পরেই ইঁদুর তিনটি তাদের পূর্ব পুরুষোচিত স্বভাব নেতৃত্বের গুণ ও সাহস ফিরে পায়।

নারী-পুরুষের এই স্বভাবসম্মত পার্থক্য আধুনিক বিজ্ঞান সমর্থিত হওয়ার পর প্রশ্ন জাগে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে। ইসলামী শরীয়ত এর কি ব্যাখ্যা দেয়?

কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে এরশাদ করছেন, "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

তাফসিরে মাআরেফুল কুরআনে এ আয়াত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ-নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্যও থাকবে না। বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ পুরুষকে জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারীজাতির উপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যা অর্জন করা নারীজাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষের নিজের উপার্জন কিংবা নিজ সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

প্রথম কারণটি হলো, আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি মানুষের নিজরে আওতাভুক্ত ও ক্ষমতাভিত্তিক।

এ যেন একই পিতামাতার সন্তানদের অবস্থা। তাদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত হিসাবে নির্ধারণের জন্য বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য হয়ে উঠে।

১. যাকে শাসক নিয়োগ করা হবে তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা।

২. তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি।

প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণটি শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোষ ও মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে তখনই সে তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়। সারকথা, অধিকাংশ বিষয়ে নারী-পুরুষের অধিকারের সমতাবিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হল পুরুষের শাসিত ও অধীন।

## অজাচার , বিজ্ঞান ও কুরআন

সেই একই সংখ্যার নিউজ উইকে পাশাপাশি আরেকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবারের পরীক্ষার বিষয়টি হলো অজাচার অর্থাৎ নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক। এতদ্দেশীয় প্রাচীন সহজিয়া মতবাদের মতই পাশ্চাত্যে একদল তথাকথিত বিপ্লবী ও বুদ্ধিজীবির আবির্ভাব ঘটেছে, যারা মনে করেন নারী-পুরুষের বৈবাহিক বা দৈহিক সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ শুধু সামাজিক কুসংস্কার নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামিও বটে। তাদের মতে মা ও ছেলে, বাপ ও মেয়ে, ভাই ও বোন এবং এমনি ধরনের নিজস্ব রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক বা দৈহিক সম্পর্ক ধর্মীয় গোঁড়ামি দূরীকরণের স্বার্থেই পুনঃপ্রচলিত হওয়া চাই। এ বিষয়ে তারা ফ্রয়েডীয় কামকেন্দ্রিক মনোবিজ্ঞানের দোহাই ঝাড়েন। অনেকে এসব বিষয়ে শুধু বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং নিজেরা সেই অজাচারের পরাকাষ্ঠাও দেখিয়েছেন।

পরিশেষে বিষয়টা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জনৈকা চেকোশ্লোভাকীয় গবেষক তার চিকিৎসা গবেষণায় প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে ধর্মীয় অভিমত পুরাপুরিভাবেই বিজ্ঞানসম্মত। ডাঃ ইভা সিমানোভা নামক উক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানী বিভিন্ন

বিচারালয়, হাসপাতাল, কুমারী মায়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ' হোম' ও এতিমখানায় অনুসন্ধান করে বিশেষ বিশেষ নারী ও পুরুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে ১৬১টি শিশুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব শিশুর মা হচ্ছেন সেইসব মহিলা যারা পিতা, ভ্রাতা বা পুত্রের কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে এসব সন্তান প্রসব করেছেন। গবেষণার জন্য নির্ধারিত এই মহিলাদেরই আবার ৯৫টি অপরাপর সন্তানও বিদ্যমান ছিল, যাদের জন্মের ব্যাপারে দায়ী ছিল রক্ত সম্পর্ক বহির্ভূত অন্য মানুষ। বিজ্ঞানী ইভা তার পরীক্ষায় দেখতে পেয়েছেন, ধর্মের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ ও সামাজিকভাবে ঘৃণ্য অজাচারে জন্ম লাভ করেছে যে ১৬১টি শিশু তাদের অধিকাংশই ছিল গর্ভপাতের বিকৃত ফল, ১৫জন মৃতজাত অথবা জন্মের এক বছরের মধ্যেই মারা গেছে। আর ৫ জন মারা গেছে কিছুটা বয়স হয়ে। অজাচারে অর্থাৎ মা-ছেলে, বাপ-মেয়ে অথবা ভাই-বোনের দৈহিক মিলনের ফলে জন্ম গ্রহণ করে যেসব শিশু জীবিত ছিল, তাদের মধ্যেও ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন চেকোশ্লোভাকীয় সেই গষেক ডাঃ ইভা সিমানোভা।

চেকোশ্লাভাকিয়ান সায়েন্স একাডেমীতে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি দেখেছেন ঃ অজাচারে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের শতকরা ৪০ জনেরও বেশি হয় দৈহিক অথবা মানসিক অথবা উভয় ধরনের বৈকল্যযুক্ত। এদের অনেকেই পুরোপুরি উম্মাদ। কেউ বামনাকৃতির, কারো হৃদপিণ্ড বা মস্তিষ্কের গঠন ক্রতিযুক্ত, কেউ পুরো বধির, আবার কেউ কেউ অপরাপর দৈহিক লিঙ্গগত ক্রতিযুক্ত। পক্ষান্তরে ডাঃ ইভা সিমানোভা দেখতে পেয়েছেন যে, এই নারীদের অজাচারমুক্ত অপরাপর ৯৬টি সন্তানের মধ্যে কারো এ ধরনের কোন মানসিক বৈকল্য নেই। মাত্র ৪.৫% ভাগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে দৈহিক কোন ক্রটি।

বস্তুত ডাঃ ইভার গবেষণা অথবা যে কোন গবেষণাই দীন-ধর্মের অনুকূলে হবে নিঃসন্দেহে। কুরআন পাকের সূরায়ে নিসাতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সেই মাতা যে তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে যাদের সাথে বিবাহ হারাম এমন নারীদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অজাচারের যে মোটেই অনুমিত নেই তা বলাই বাহুল্য।

# মহিলাদের নামায সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য মাসায়েল

## নামায

মহিলা ও পুরুষের নামাযের ধরন প্রায় একই রকমের। তবে নারীর নারীত্ব-পর্দার প্রেক্ষিতে নামায আদায়ের কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা রয়েছে। নিম্নে কেয়াম, (দাঁড়ানো) রুকূ, সেজদা ও কাদাহ ( বৈঠক) এর সঠিক পদ্ধতিসমূহ আলোচিত হয়েছে। [১]

## কেয়াম ( দাঁড়ানো)

০ দাঁড়ানো অবস্থায় মহিলারা উভয় পা মিলিয়ে রাখবে। মাঝখানে কোন দূরত্ব থাকবে না। এভাবে রুকূ ও সেজদায় টাখনু মিলিয়ে রাখবে। (আর পুরুষেরা দাঁড়ানোর সময় উভয় পায়ের মাঝে চার পাঁচ আঙুল ফাঁক রাখবে)।

০ মহিলাদের ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার অসুবিধা থাকুক বা না থাকুক, সকল ক্ষেত্রেই তারা চাদর বা ওড়নার ভেতর হাত রাখবে এবং প্রথম তাকবির বলার সময় ওড়নার ভেতর থেকেই হাত উঠাবে। (পুরুষেরা চাদর পরে থাকলে প্রথম তাকবির বা তাকবিরে তাহরিমার সময় চাদর ইত্যাদি থেকে অবশ্যই হাত বরে করে নেবে।)

০ তাকবিরের সময় মহিলারা শুধুমাত্র কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। (আর পুরুষেরা হাত এত উঁচু করবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি বরাবর হয় কিংবা তা স্পর্শ করে কানের লতি।)

০ মহিলারা তাকবিরে তাহরিমা বা প্রথম তাকবিরের পর দু'হাত সিনার উপর বাঁধবে। (আর পুরুষেরা নাভীর নীচে হাত বাঁধবে।)

০ মহিলারা হাত বাঁধার সময় শুধু ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর স্থাপন করবে। দু'আঙুলে বৃত্তাকার কিংবা ডান হাতে বাম হাতের কব্জি ধরার প্রয়োজন নেই। (আর পুরুষেরা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দিয়ে বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে। ফলে আঙুল দু'টো বৃত্তাকারে রূপান্তরিত হবে। এক্ষেত্রে মাঝখানের আঙুল তিনটি কব্জির উপর সোজাভাবে বিস্তৃত থাকবে।

## রুকূ

০ মহিলাদের জন্য রুকূতে মাথা বেশি ঝুঁকানো ঠিক নয়। বরং তারা এতটুকু ঝুঁকবে যাতে দু'হাত হাটু পর্যন্ত পৌছে। (আর পুরুষেরা রুকূ করার সময়

১. নামায ও প্রশ্নোত্তর সম্বলিত মাসায়েলসমূহ ইউসুফ লুধিয়ানভীর "আপকে মাসায়েল" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

এতটুকু ঝুঁকবে যাতে তাদের কোমর একেবারে সোজা থাকে এবং মাথা ও নিতম্ব বরাবর হয়।)

০ মহিলারা রুকূতে উভয় হাতের আঙুলসমূহ ছড়িয়ে না দিয়ে বরং মিলিয়ে রাখবে। (আর পুরুষরা রুকূতে আঙুলসমূহ ছড়িয়ে রাখবে।)

০ মহিলারা রুকূতে গিয়ে হাঁটুতে হাত রাখবে কিন্তু মাথা বেশি নোয়ানো যাবে না। (আর পুরুষেরা পুরোপুরিভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে রুকূ করবে।)

০ মহিলারা রুকূতে দৃঢ়ভাবে হাঁটু চেপে ধরবে না। বরং স্বাভাবিকভাবে হাঁটুর উপর হাত রেখে দিবে। (আর পুরুষেরা দু'হাতে হাঁটু চেপে ধরবে।)

০ রুকূতে মহিলারা তাদের কনুই পাঁজরের সাথে লাগিয়ে রাখবে। (আর পুরুষেরা কনুই পাঁজর থেকে পৃথক রাখবে।)

**সেজদা**

০ সেজদায় মহিলারা কনুই মাটিতে বিছিয়ে দিবে। (আর পুরুষেরা কনুই মাটি থেকে উপরে রাখবে।)

০ সেজদায় মহিলারা উভয় পা দাঁড় করে রাখবে না বরং তা ডানদিকে বের করে দিবে। এবং একেবারে মাটিতে লেগে সেজদা করবে, নিতম্ব উঁচু রাখবে না। (আর পুরুষেরা উভয় পা ও পায়ের আঙুলসমূহ খাড়া করে রাখবে এবং নিতম্ব পা থেকে পৃথক করে উঁচু করে রাখবে।)

০ সেজদায় মহিলারা পেট ও উরু একত্রে মিলিয়ে রাখবে এবং বাহুদ্বয় পাঁজরের সাথে মিলিত থাকবে।

**সারকথা,** মহিলারা একেবারে জড়সড় হয়ে সেজদা করবে। আর পুরুষেরা পেট উরু থেকে ও বাহু পাঁজর থেকে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক রাখবে।

**কাদাহ্ (বৈঠক)**

০ বৈঠকে মহিলারা উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসবে। অর্থাৎ নিতম্ব মাটির উপর থাকবে পায়ের উপর নয়। (আর পুরুষদের প্রতি নির্দেশ হল, তারা বৈঠকে ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বস।)

০ বৈঠকের সময় মহিলারা হাতের আঙুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে। (আর পুরুষেরা আঙুলসমূহ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবে। খোলাও রাখবে না কিংবা মিলিয়েও রাখবে না। বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে।)

# মহিলাদের নামায সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

**প্রশ্ন ঃ** মেয়েদের কত বছর বয়সে নামাজ ফরজ হয়?

**উত্তর ঃ** প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার সময় জানা থাকলে তখন থেকেই নামাজ ফরজ হবে। নতুবা নয় বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর দশ বছর থেকেই নামাজ ফরজ হবে।

**প্রশ্ন ঃ** অনেকেই বলে থাকেন, মেয়েরা নামাজ পড়ার সময় অবশ্যই বক্ষবন্ধনী বা ভেতরের কাপড় ব্যবহার করবে। এটি পরিধান না করলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কারণ এই সিনাবন্ধ বা বক্ষবন্ধনী কাফনের কাপড়সমূহের মধ্যেও রয়েছে। অথচ বিভিন্ন কিতাবাদীতে লেখা আছে, নামাজের সময় মেয়েরা হাত, পা ও মুখমণ্ডল ব্যতিত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখবে। এ প্রেক্ষিতে আমাদের কি করণীয়?

**উত্তর ঃ** নামাজ পড়ার সময় মহিলারা হাত, পা ও চেহারা ব্যতিত বাকি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালভাবে ঢেকে নিবে। সিনাবন্ধ বা বক্ষবন্ধনীর ব্যবহার জরুরী কিছু নয়।

**প্রশ্ন ঃ** শিশুসন্তান কখনো মায়ের সেজদার স্থানে শুয়ে থাকে। যখন মা সেজদা করে তখন শিশু মায়ের পিঠে চড়ে বসে কখনো মায়ের ওড়না ফেলে দেয়, চুল এলোমেলো করে দেয়। এ সব অবস্থায় কী মায়ের নামাজ হবে?

**উত্তর ঃ** নামাজ পড়ার সময় যদি মাথার কাপড় খুলে যায় এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়তে যে সময় লাগে সে পরিমাণ সময় যদি মাথা খোলা থাকে তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর মাথার ওড়না খুলে যাওয়ার সাথে সাথে যদি তা ঢেকে দেওয়া হয়, তবে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

**প্রশ্ন ঃ** অনেক মেয়েরা শাড়ি পড়ে। তারা কি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারবে?

**উত্তর ঃ** তাদের জন্যও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ। আর সর্বাবস্থায় এমন পোশাক পরিধান করা চাই, যাতে সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা সম্ভব হয় এবং শরীরের কিছুই অনাবৃত হয় না। বিনা ওজরে বসে নামাজ পড়া বৈধ নয়। যদি শাড়ি দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করা সম্ভব হয় তবে শাড়ি পরে নামাজ পড়া যেতে পারে। তবে শাড়ি না পরাই উত্তম। কারণ এতে পর্দাহীনতার আশঙ্কা থাকে বেশি।

**প্রশ্ন ঃ** নামাজে কি সিনায় ওড়না রাখা ও হাতের কব্জি ঢেকে রাখা জরুরী?

**উত্তর ঃ** কব্জি থেকে অবশিষ্ট অংশ খোলা রাখতে কোন অসুবিধা নেই। তবে নামাজে সিনার ওড়না থাকা জরুরী।

**প্রশ্ন ঃ** নামাযের সময় হয়ে গেলে আজান শোনা ব্যতিতই কি মহিলারা ঘরে নামাজ পড়তে পারবে? নাকি আজানের অপেক্ষা করবে?

**উত্তর ঃ** নামাজের সময় হয়ে গেলে আজান শোনা ব্যতিতই প্রথম ওয়াক্তেই নামাজ পড়া মহিলাদের জন্য উত্তম। তাদের জন্য আজানের অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে যদি নামাজের সময় সম্পর্কে অবগত হতে না পারে, তবে সে ক্ষেত্রে আজানের অপেক্ষা করে নেবে।

**প্রশ্ন ঃ** মহিলা কিংবা যুবতীরা ঘরের ছাদে নামাজ পড়তে পারবে কি না?

**উত্তর ঃ** যদি ছাদে পর্দার সাথে নামাজ পড়া সম্ভব হয়, তবে ছাদে নামাজ পড়তে পারে। তবে মহিলাদের ঘরে নামাজ পড়াই উত্তম।

**প্রশ্ন ঃ** মহিলাদের তো বর্তমানে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়? তবে তারা যদি নিজের স্বামীর পেছনে ঘরে নামাজ পড়তে চায় তাহলে তা কী বৈধ হবে?

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ স্বামী-স্ত্রী ঘরে জামাত করে নামাজ পড়তে পারে। তবে স্ত্রী স্বামীর বরাবর নয়, বরং পেছনে দাঁড়াবে।

**প্রশ্ন ঃ** মহিলারা কি জামাতে নামাজ পড়তে পারবে? যদি বাড়ির পুরুষের মধ্যে কেউ ঘরে তারাবির নামাজ পড়ায় তবে কী মেয়েরা সেই জামাতে তারাবির নামাজ পড়তে পারবে? এ অবস্থায় ইমাম সাহেবের কী মহিলাদের ইমামতির নিয়ত করতে হবে?

**উত্তর ঃ** যদি ঘরে জামাতের ব্যবস্থা হয়, তবে তা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার। ঘরের মেয়েরা সেই জামাতে শরিক হতে পারবে। তবে পুরুষ লোক মসজিদ থেকে ফরজ নামাজ পড়ে আসবে। আর ইমাম সাহেব নারী মোক্তাদির ইমামতির নিয়ত করে নেবেন।

**প্রশ্ন ঃ** ইসলামী শরীয়তে মহিলারা ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে পারে কি না?

**উত্তর ঃ** মেয়েরা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না। আর মেয়েদের জন্য মেয়েদের ইমামতি করা মকরুহ।

**প্রশ্ন ঃ** মেয়েরা মেয়েদের ইমামতি কিভাবে করবে?

**উত্তর ঃ** কোন মেয়ে যদি মেয়েদের ইমামতি করে, তবে যে মেয়ে ইমাম হবে সে সম্মুখে দাঁড়াবে না বরং মেয়েদের কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে। (উল্লেখ্য, এ ধরনের জামাত মকরুহ– তা পূর্বেই বলা হয়েছে।)

**প্রশ্ন ঃ** জুমার দিন যোহরের সময় দুই আজান হয়। আর যেহেতু মহিলাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়, তাই এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে কিছু লোকের ধারণা এই যে, মহিলাদের প্রথম আজান হওয়ার পর যোহরের

নামাজ পড়া উচিত নয়। বরং লোকজন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করে নিলে তারপর মেয়েরা যোহরের নামাজ পড়বে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের ফয়সালা কি?

**উত্তর** ঃ ইসলামে মহিলাদের ব্যাপারে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং তারা যোহরের সময় হলেই যোহরের নামাজ আদায় করে নেবে।

**প্রশ্ন** ঃ মহিলারা জুমার নামাজ কত রাকাত পড়বে?

**উত্তর** ঃ কোন মহিলা যদি মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ পড়ে, তবে পুরুষরা যত রাকাত পড়ে মহিলাকেও তত রাকাতই পড়তে হবে। অর্থাৎ প্রথমে চার রাকাত সুন্নত, তারপর দু'রাকাত ফরজ, তারপর চার রাকাত সুন্নত ও দুই রাকাত সুন্নতে গাইরে মুআক্কাদা। মহিলাদের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়। তাই যদি তারা ঘরে নামাজ পড়ে, তবে যোহরের নামাজ আদায় করবে। (আর তাদের জন্য এটাই সর্বোত্তম।)

**প্রশ্ন** ঃ মহিলারা যদি জামাতে হাজির হয়, তাহলে তাদের কাতার কোথায় হবে?

**উত্তর** ঃ মহিলারা যদি জামাতে হাজির হয় তবে তারা পুরুষ ও বাচ্চাদের পেছনে দাঁড়াবে।

**প্রশ্ন** ঃ মহিলাদের উপর দুই ঈদের নামাজ ওয়াজেব কি না?

**উত্তর** ঃ তাদের উপর দুই ঈদের নামাজের কোনটাই ওয়াজেব নয়।

**প্রশ্ন** ঃ নামাযে মহিলারা উচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়তে পারে কি?

**উত্তর** ঃ নামাজে মহিলাদেরকে উঁচু আওয়াজে কেরাত পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। নামাজ চাই জাহরী তথা উচ্চস্বরে কেরাত পড়ার বিধান সম্বলিত হোক বা সিররী তথা অনুচ্চস্বরে কেরাত পড়ার বিধান সম্বলিত হোক – সকল ক্ষেত্রেই তাদের নফরজব কেরাত পড়তে হবে। বরং যেহেতু অনেক ফকীহের নিকট মহিলাদের আওয়াজও "সতর' ভুক্ত, সুতরাং কোন মহিলা যদি উচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়ে তবে তাদের মতে উক্ত মহিলার নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন** ঃ স্ত্রী কী নিজ স্বামীর সাথে নামাজ আদায় করতে পারবে? একই সময়ে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে নিজেদের নামাজ আদায় করতে পারবে কী?

**উত্তর** ঃ যদি স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন নামাজ আদায় করে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি স্বামী-স্ত্রী জামাত করে নামাজ পড়তে চায়, তাহলে স্ত্রী অবশ্যই পেছনে দাঁড়াতে হবে।

**প্রশ্ন ঃ** যেখানে শুধু ইমাম সাহেব ব্যতিত কোন বালেগ পুরুষ নেই সেখানে ইমাম সাহেব কী শুধু মহিলা ও বাচ্চাদের নিয়ে জামাত করতে পারেন?

**উত্তর ঃ** যদি কোন বালেগ পুরুষ না থাকে, তবে শুধু মহিলা ও বাচ্চাদেরকে নিয়ে ইমাম সাহেব জামাত করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে দাঁড়ানোর নিয়ম হচ্ছে ঃ প্রথমে ইমামের পেছনে হবে বাচ্চাদের কাতার বা সারি। তারপর মহিলাদের কাতার। আর যদি বাচ্চা মাত্র একজন হয়, তবুও সে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে।

**প্রশ্ন ঃ** একজন মহিলা ও দু'জন পুরুষের সমাবেশ। তারা জামাতে নামাজ আদায় কতে চান। একজন পুরুষ ইমাম হলে বাকী দু'জন কিভাবে দাঁড়াবে? কতটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াবে? এরা কি জামাত করে নামাজ আদায় করতে পারবে?

**উত্তর ঃ** মোক্তাদী পুরুষ ইমাম পুরুষের ডানে একটু পেছনে দাঁড়াবে। আর মহিলা একেবারে কাতারে একাকী দাঁড়াবে।[১]

# কয়েকটি সমকালীন প্রশ্নের জবাব

## নাপাক চর্বি দ্বারা প্রস্তুতকৃত সাবান

**প্রশ্ন ঃ** মৃত ও হারাম জন্তুর চর্বিতে প্রস্তুতকৃত সাবান দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় কি না? এ ধরনের সাবান ব্যবহার করলে নামাজ শুদ্ধ হবে কি না?

**উত্তর ঃ** নাপাক চর্বি ব্যবহার করা জায়েয নেই। তবে এ ধরনের সাবান যাতে নাপাক চর্বি দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা জায়েয। কারণ সাবান প্রস্তুতের পর উক্ত চর্বির অস্তিত্বই বিলীন হয়ে গেছে।

## লিপিস্টিক, পাউডার ও ক্রীম ইত্যাদির ব্যবহার

**প্রশ্ন ঃ** মহিলাদের জন্য (সবার জন্যই ...) নখপালিশ ব্যবহার গুনাহের কাজ। নকপালিশ লাগালে অজু হয় না। তাই এটি ব্যবহার করলে নামাজও শুদ্ধ হয় না। কিন্তু ক্রীম, পাউডার কিংবা লিপিস্টিক লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? আপাতদৃষ্টিতে এতে অজুর পানি পৌছতেও কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। অতএব এগুলোর ব্যবহার কেমন হবে?

**উত্তর ঃ** ক্রীম, লিপিস্টিক ও পাউডার ইত্যাদিতে যদি কোন নাপাক বস্তু মিশ্রিত না থাকে, তাহলে এসব ব্যবহারে কোন বাধা নেই। তবে নখপালিশের

---

১. আপকে মাসায়েল ঃ মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী

মতই লিপিস্টিকের একটা হালকা প্রলেপ পড়ে। অজু-গোসলের সময় সতর্কতার সাথে এগুলো উঠিয়ে ফেলা জরুরী।

## সহবাসের পর সমস্ত চুল ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা

**প্রশ্ন ঃ** স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর গোসলের সময় সমস্ত মাথায় চুল ধুবে কি না? মহিলাদের জন্য মাথার চুল ধোয়া ছাড়াই পবিত্রতা অর্জন সম্ভব কি না?

**উত্তর ঃ** পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ চুল ধোয়া জরুরী। কিন্তু মহিলাদের মাথায় খোপা করা থাকলে সম্পূর্ণ চুল ধোয়া জরুরী নয় বরং এ ক্ষেত্রে শুধু চুলের গোড়ায় পানি প্রবেশ করালেই গোসলের ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

(হেদায়া ঃ ১ম খণ্ড)

## চুম্বন অজু ভঙ্গের কারণ কি না?

**প্রশ্ন ঃ** মোয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত, স্ত্রীকে চুম্বন করলে অজু ভেঙ্গে যায়। হানাফী মাজহাবে এর সঠিক ব্যাখ্যা কি দেওয়া হয়েছে?

**উত্তর ঃ** হানাফী মাজহাব মতে স্বামী স্ত্রীকে বা উভয়ের যে কেউ অপরজনকে চুম্বন করলে অজু ভঙ্গ হয় না, যদি তরল ও আঠালো পানি নির্গত না হয়। মোয়াত্তা ইমাম মালেকের বর্ণিত হাদিসের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে অজু করে নেওয়া মোস্তাহাব।

## মাসিকের সময় কুরআন তেলাওয়াত

**প্রশ্ন ঃ** এক মহিলা ছোট বেলায় কুরআন শরীফ পড়া শিখতে পারেনি তাই এখন শিখছে। তার শিক্ষিকা বলেছেন, 'মাসিকের দিনগুলোতেও পড়তে এসো। আমপারার পৃষ্ঠা আমি উল্টিয়ে দেব। কেননা পড়বে তো মুখ দিয়ে, আর মুখ সর্বাবস্থায় পাক থাকে।' এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এ কথাটি সঠিক কিনা?

**উত্তর ঃ** বিশেষ দিনগুলোতে মেয়েরা দেখে দেখেও কুরআন শরীফ পড়তে পারবে না। এমনিভাবে যে পুরুষ বা মহিলার উপর গোসল ফরজ হয়েছে তার জন্যও কুরআন শরীফ তেলাওয়াত জায়েয নয়। শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকার বর্ণনাকৃত মাসআলা শুদ্ধ নয়। এ অবস্থায় পানাহারের জন্য তো মুখ পাক থাকে, কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের জন্য তা পাক নয়। যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো এমনিতে পাক থাকে কিন্তু নামাজের জন্য অজু ব্যতিত তা পাক হয় না। এ ধরনের নাপাকীকে 'নাপাকে হুকমী' বলা হয়। মাসিক ও নেফাসের সময় মুখ তথা জিহ্বা 'হুকমী' পাক থাকে। তবে তাসবীহ, জিকির, দোয়া ইত্যাদি করা জায়েয আছে।

## মাসিকের সময় মুখস্ত কুরআন তেলাওয়াত

**প্রশ্ন ঃ** মাসিক ও নেফাসের দিনগুলোতে কুরআনের হাফেজা মহিলারা মুখস্ত কুরআন শরীফ পড়তে পারবে কি না?

**উত্তর ঃ** বিশেষ দিনগুলোতে মহিলাদের জন্য কুরআনের কোন আয়াত পড়া জায়েয নেই। তবে দোআ হিসাবে কুরআনের আয়াত পড়তে পারবে, এটি জায়েয। তবে যদি কোন মহিলা 'হাফেজা' হয়, তাহলে কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ রাখার জন্য জিহ্বা না নেড়ে মনে মনে তেলাওয়াত করতে পারবে। আর কখনো কোন আয়াত ভুলে গেলে, হাতে কোন কাপড় পেঁচিয়ে কুরআন শরীফ খুলে আয়াতটি দেখে নিতে পারে।

## হাদিস মুখস্ত করা ও কুরআনের তরজমা পাঠ

**প্রশ্ন ঃ** আমি একজন মাদ্রাসার ছাত্রী, রিয়াজুস সালেহীন (আরাবি) পড়ি এবং হাদিস কণ্ঠস্থ করি। পবিত্র কুরআনের তরজমা পড়ি। ঋতুকালেও কি উক্ত হাদিস কণ্ঠস্থকরণ ও কুরআনের তরজমা পাঠ সম্ভব?

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ, উভয়টি করতে পারেন কোন বাধা নেই।

## মাসিকের সময় কুরআন বিষয়ক পরীক্ষা

**প্রশ্ন ঃ** পবিত্র কুরআনের কয়েকটি সূরা আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থায় ঋতুস্রাব শুরু হলে পবিত্র কুরআনের পরীক্ষার উত্তরপত্র কিভাবে লিখবো? কেননা, পরীক্ষায় কুরআনের মূল আয়াত ও তার তরজমা-তাফসির ইত্যাদি আনুষাঙ্গিক অনেক কিছুই লিখতে হয়। এ ব্যাপারে আমাদের কী করণীয়?

**উত্তর ঃ** তরজমা ও ব্যাখ্যা লিখতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। মূল আয়াত লেখা যাবে না। আয়াত লেখার প্রয়োজন হলে সেখানে শুধু আয়াতের সূত্র উল্লেখ করে আয়াতের তরজমা লেখা যেতে পারে।

## ঋতুকালে ছাত্রী-শিক্ষিকার পাঠদান সমস্যা

**প্রশ্ন ঃ** (১) ছাত্রীরা মাসিকের দিনগুলোতে কুরআন শরীফ পড়তে পারবে কি না?

(২) অনেক শিক্ষিকা শিশুদেরকে আরবি কায়দা, নাজেরা ও হেফজ করান। কেউ কেউ স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে ইসলামিয়াতের ক্লাশ নেন। মাসিকের সময় তারা কিভাবে পাঠদান করবেন?

**উত্তর ঃ** (১) মহিলাদের জন্য বিশেষ দিন গুলোতে কুরআনের তেলাওয়াত জায়েয নেই এবং তা স্পর্শ করাও জায়েয নেই। চাই তা কুরআনের এক আয়াত কিংবা তার চেয়ে কম হোক না কেন. সর্ববস্থায়ই তা নাজায়েয। তবে হ্যাঁ কুরআনী আয়াতের যে অংশটি দোআ হিসাবে পড়া হয় তা পড়তে কোন দোষ নেই। যেমন খাবার খেতে শুরু করলে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ কিংবা শুকরিয়া স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ ইত্যাদি। এমনি ভাবে কুরআনে কারীমে যে সমস্ত আয়াত সাধারণ কথাবার্তায় প্রবাদ বাক্যের মত ব্যবহৃত হয় সে সব আয়তও পড়া জায়েয।

(২) কুরআনে কারীমের শিক্ষায়িত্রীদের জন্যও সেই একই নির্দেশ। তারাও বিশেষ দিনগুলোতে কুরআন পাকের তেলাওয়াত কিংবা তা স্পর্শ করতে পারবেন না। তবে এক্ষেত্রে যাতে শিক্ষা গ্রহণ বা প্রদান যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য ওলামায়ে কেরাম এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলে থাকেন। আর তা হচ্ছে এই যে, শিক্ষিকাগণ এ অবস্থায় কুরআনের বাক্য গুলো পৃথক পৃথক শব্দে উচ্চারণ করবেন। যেমন সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াতটি আলহামদু-লিল্লাহ-রাব্বিল-আলামিন এভাবে ভিন্ন ভিন্ন করে পড়বেন।

## মহিলাদের উপড়ে যাওয়া চুল

**প্রশ্ন ঃ** মাথা আঁচড়ানোর সময় সাধারণত অসংখ্যা চুল উঠে আসে। অনেক মহিলা বলে থাকেন, উঠে যাওয়া চুল যেখানে সেখানে ফেলতে নেই, করবস্থানে তা পুঁতে রাখা উচিত। এ ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা কী?

**উত্তর ঃ** মহিলাদের চুলও পর্দার অন্তর্ভুক্ত। যে সব চুল মাথা আঁচড়ানোর সময় উঠে আসে সেগুলো কোন না মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) ব্যাক্তিতে দেখতে দেওয়া জায়েয নয়। সুতরাং মাথার চুল যত্রতত্র ফেলা ঠিক নয় বরং কোন স্থানে পুঁতে রাখা জরুরী। তবে তা কবরস্থানই হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

## ওয়াশিং মেশিনে ধোলাইকৃত কাপড়

**প্রশ্ন ঃ** ওয়াশিং মেশিনে ধোলাইকৃত কাপড় পাক কি না?

**উত্তর ঃ** ওয়াশিং মেশিনে সাবানের পানি দ্বারা কাপড় ধোয়া হয়। প্রথমবার পানি দিয়ে তা বের করে দ্বিতীয় বার নতুন পানি দেওয়া হয়। এভাবে যতক্ষণ কাপড়ে সাবান থাকে, ততক্ষণ পানি ঢালা হয়। এজন্য ওয়াশিং মেশিনে ধোলাইকৃত কাপড় পাক হয়ে যায়। অতএব তা পরিধান করে নামাজ পড়তে কোন দোষ নেই।

## নাপাক জায়গা শুকিয়ে গেলে পাক হয়ে যায়

**প্রশ্ন ঃ** প্রায় সব ঘরেই থাকে শিশু, তারা দিনে একাধিকবার ঘরের বিছানায়, মেঝে ইত্যাদিতে পেশাব করে থাকে। এসব স্থানে বসা, শোয়া ও নামাজ, তেলাওয়াত ইত্যাদি জায়েয আছে কী? উল্লেখ্য যে, এ স্থানগুলো ছায়ার মধ্যেই শুকিয়ে যায়।

**উত্তর ঃ** নাপাক জমিন শুকিয়ে গেলে তা নামাজের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। এসব নাপাক স্থান শুকিয়ে গেলে তাতে কাপড় বিছানো ছাড়াই নামাজ পড়া যাবে। তবে সেখানে কাপড় বিছিয়েও নামাজ আদায় করতে অসুবিধা নেই।

## কাপড়ে কুকুরের স্পর্শ

**প্রশ্ন ঃ** আজকাল মুসলমানরাও ইংরেজদের মতো কুকুর প্রতিপালন করে। এসব কুকুর যদি শরীর কিংবা কাপড় স্পর্শ করে তাতে কী শরীর বা কাপড় নাপাক হয়ে যাবে? কুকুরের শরীর যদি ভেজা না থাকে তবুও কী শরীর-কাপড় নাপাক হবে?

**উত্তর ঃ** যারা শখের বশে কুকুর লালন-পালন করে, তাদের জন্য কুকুরের পাক-নাপাকীর বিষয়টি তো একেবারেই গৌণ।

যাই হোক, প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, যদি কোন কাপড় কিংবা অন্য কোন বস্তুর সাথে কুকুরের ছোঁয়া লাগে, তবে সেই কাপড় কিংবা বস্তু নাপাক হবে না যদি কুকুরের গায়ে স্পষ্ট কোন নাপাকী না থাকে। এ ক্ষেত্রে কুকুরের দেহ শুষ্ক কিংবা ভেজা– যেরকমই হোক না কেন এতে শরীর বা কাপড় কিছুই নাপাক হবে না। তবে কুকুরের মুখের লালা যেখানে লাগবে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর কুকুর সাধাণত কাপড়-চোপড়ে মুখ দেয়, এতে কাপড় নাপাক হয়ে যায়।

## নারীর মর্যাদা সম্বলিত বিভিন্ন হাদিস

### জান্নাতের পথ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজান শরীফের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তবে সে যেন যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। (তাবরানী)

## শহীদ খেতাব

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নেককার বিধবা মহিলাকে আসমানে 'শহীদ' আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ আসমানে তার জন্য যেসব বিষয় সম্পাদিত হয়ে থাকে তাতে তাকে 'শহীদ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। (দায়লামী)

## জান্নাতে প্রবশ

৩। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। (ইবনে মাজাহ)

## মায়ের অনন্যসাধারণ মর্যাদা

৪। হযরত হাসান বিন সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, (হে মহিলারা!) তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট আছ যে, যখন তোমাদের কেউ নিজ স্বামী কর্তৃক গর্ভধারণ করে এবং স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হয়। তখন সে আল্লাহর পথে রোজা পালনকারী ও রাত্র জাগরণকারীদের মত সাওয়াব লাভ করে। আর যখন তার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় তখন তার চোখের শীতলতার তথা শান্তির জন্য যে গোপন ব্যবস্থা নেওয়া হয় সে সম্পর্কে আসমান ও জমিনের কেউ অবগত হয় না। আর যখন সে (মহিলা) সন্তান প্রসব করে তখন তার দুধের প্রতিটি ঢোক আর চোষণের জন্য এক একটি নেকী দেওয়া হয়। আর যদি সন্তানের জন্য মায়ের রাত জাগরণ করতে হয়, তবে সে আল্লাহর পথে সত্তর গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব লাভ করে। তোমরা কি জান এ সকল মহিলা কারা? এরা সুন্দর-সুখী জীবন-যাপনকারিণী নেককার মহিলা যারা স্বামীর অবাধ্য হয় না। (কানযুল ওম্মান)

## তিনটি শিশুর মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ কারিণী

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে নারীর তিনটি নাবালেগ শিশু মারা যায় আর সে ধৈর্যধারণ করে সাওয়াবের আশায়। তবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মেশকাত)

## দো-জাহানের কল্যাণ লাভের উপায়

৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে চারটি বস্তু লাভ করে সে দুনিয়া ও আখেরাতের সম্পদ লাভ করবে।

১. এমন অন্তর যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

২. যে মুখ সদা আল্লাহর যিকরে নিমজ্জমান।

৩. মুসীবতে ধৈর্যধারণকারী দেহ।

৪. এমন মহিলা যে নিজের ইজ্জত-আব্রু ও স্বামীর সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণকারিণী।

## উত্তম মহিলা

৭। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম মহিলা সে-ই যে সতীসাধ্বী এবং মহব্বতকারিণী। অর্থাৎ যে নিজের আব্রু হেফাজত করে এবং স্বামী প্রেমে মাতোয়ারা। (কানযুল ওম্মাল)

## উত্তম মহিলা

৮। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করা হলো, উত্তম মহিলা কে? তিনি বললেন, যার প্রতি স্বামী দৃষ্টি দিলে সে (মহিলা) তাকে সন্তুষ্ট করে এবং স্বামী নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে এবং স্বামীর অপছন্দনীয় বিষয়ে নিজের অন্তর ও স্বামীর সম্পদে বিরুদ্ধাচরণ করে না। (মেশকাত)

## তাহাজ্জুদ পাঠকারিণী ও তার পানির ছিটা

৯। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এমন নারীর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জানিয়ে দেয়। যদি সে এতে আপত্তি করে তবে তার চোখে মুখে পানি ছিটা দেয়।

## উপকারী বস্তু

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হচ্ছে সাময়িক উপকারী বস্তু। তবে সবচেয়ে উপকারী বস্তু হচ্ছে নেককার মহিলা। (মুসলিম)

## আল্লাহর কর্মী

১১। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওদ্দাহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক সাহাবী এলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন গৃহে উপস্থিত হই, তখন স্ত্রী বলে, মারহাবা আমার

সরদার এসেছে। আর যদি আমাকে বিষন্নচিত্ত দেখে তখন বলে, দুনিয়ার চিন্তা কিসের? আখেরাত তো আমাদের।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বলে দাও যে, সে আল্লাহর অন্যতম কর্মী। জেহাদের অর্ধেক সাওয়াব পাবে।

## হুরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব

১২। হযরত হেরবান বিন হেবলা (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, পৃথিবীর নেককার নারীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরকে দুনিয়ার সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাতের হুরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হবে। (তাযকেরা ঃ ৫৫৬)

## হাজার পুরুষের চাইতে উত্তম

১৩। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নেক আমলকারিণী একজন মহিলা নেক আমল বিমুখ হাজার পুরুষের চাইতে উত্তম।

(আনিসুল ওয়ায়েজীন)

## সদাচারের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি

১৪। এক সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সদাচারের সবচেয়ে বেশী হকদার কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার মা। সাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? এরশাদ হল, তোমার মা। সাহাবী আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? এরশাদ হল, তোমার মা। সাহাবী ফের আরজ করলেন, তারপর কে? এরশাদ হল, তোমার পিতা।

## আস্বাদে প্রাধান্য

১৫। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নারীদেরকে আস্বাদ গ্রহণের দিক থেকে পুরুষের চাইতে নিরানব্বই ভাগ প্রাধান্য দান করা হয়েছে। তবে লজ্জার আবরণে তাদেরকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। (কানযুল ওম্মাল)

## নারী শিশু হত্যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

১৬। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি কোন এক যুদ্ধের ময়দানে নিহত মহিলার লাশ দেখতে পাই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে মহিলা ও শিশু হত্যা নিষেধ করে দিয়েছেন।

(সুনানুল কোবরা)

## সংখ্যাধিক্য

১৭। হযরত মুআবিয়া বিন হীদা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, সন্তান জন্মদাত্রী কৃষ্ণকায়া মহিলা সন্তান জন্মদানে অক্ষম এমন সুন্দরী মহিলার চাইতে উত্তম। আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের সাংখ্যাধিক্যের উপর গর্ব করে থাকি। এমনকি অকাল গর্ভচ্যুত সন্তান জান্নাতের দরজায় রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন নির্দেশ হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমার পিতামাতার কি অবস্থা হবে? বলা হবে, তুমি তোমার পিতামাতাসহ জান্নাতে প্রবেশ কর। (কানযুল ওম্মাল)

## সত্তর গুণ অধিক সুন্দরী

১৮। হযরত হেব্বান (রাঃ) বিন আবী হেবলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, পৃথিবীর নেককার মহিলাগণ জান্নাতের অবস্থানকারিণী হুরদের চাইতে সত্তর গুণ অধিক সুন্দরী হবেন। (তাযকেরা)

## আর সেই মহিলাও জান্নাতী

১৯। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের জান্নাতী পুরুষদের কথা বলবোনা? আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম জান্নাতী। সিদ্দীক জান্নাতী। শহীদ জান্নাতী। এভাবে শহরের একপ্রান্তে বসবাসকারী কোন মুসলমানের সাথে আল্লাহর জন্য সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তি জান্নাতী। এবং সেই মহিলাও জান্নাতী যে অধিক সন্তান প্রসবকারিণী। আর সেই মহিলাও জান্নাতী, যে স্বামীর রাগের মুহূর্তে কিংবা নিজের রাগ-গোস্বার মুহূর্তে স্বামীর হাত ধরে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি খুশী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও আমি কিছুই মুখে দেব না।

(নাসাঈ, হাদীল আরওয়াহ ঃ পৃষ্ঠা, ১১৪)

## গুনাহ ঝড়ে পড়ে যে কারণে

২০। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি দেয়,তখন আল্লাহ পাকও উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। আর যদি একে অন্যের হাত স্পর্শ করে তবে তাদের আঙুলসমূহ থেকে গুনাহ ঝরে পড়ে। (কানযুল ওম্মাল)

## অর্ধদীন লাভের মাধ্যম

২১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, যে নেককার-দীনদার মহিলা পেয়েছে তাকে যেন আল্লাহ তাআলা অর্ধদীনের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। এখন তার অবশিষ্ট অর্ধদীন অর্জনের জন্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। (কানযুল ওম্মাল)

## অকাল গর্ভচ্যুত সন্তানের মাতা

২২। হযরত মোআজ (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করে বলেন, যে মুসলমান পিতামাতার তিনটি নাবালেগ সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয় (এতে তারা সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে।) তবে আল্লাহ তাআলা তাদের পিতামাতাকে মৃত বাচ্চাদের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (এ কথা শুনে) সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যদি দু'বাচ্চার মৃত্যু হয় তবে? তিনি বললেন, দু'বাচ্চাও সুপারিশ করে পিতামাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তারা আবার আরজ করলেন, যদি একটি বাচ্চার মৃত্যু হয় তবে? এরশাদ হলো, একটি বাচ্চাও সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তারপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, অকাল গর্ভচ্যুত সন্তান তার মাকে টেনে হেঁচড়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে।
(কানযুল ওম্মাল)

## কাজের মর্যাদা

২৩। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কয়েকজন মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম্ আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে পুরুষেরা মেয়েদের চাইতে অগ্রগামী হয়েছে। আমাদের কোন আমল কী আল্লাহর পথে মুজাহিদদের আমালের সমপর্যায়ে হতে পারে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মেয়েদের জন্য নিজ গৃহের দৈনন্দিন কাজকর্ম আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদাসম্পন্ন। (দুররে মানসূর)

## মহিলার নেকী

২৪। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একজন দুষ্কর্মকারিণী মহিলার দুষ্কর্ম হাজার পুরুষের দুষ্কর্মের বরাবর। এমনিভাবে মহিলার একটি নেকী সত্তর গুণ সিদ্দীকের আমলের সমমান সম্পন্ন। (জামে সাগীর)

## জাযাকাল্লাহু আন্নী খাইরান

২৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যখন কোন মহিলাা তার স্বামীকে বলে, 'জাযাকাল্লাহু আন্নি খাইরান' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ হতে আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তখন আল্লাহ পাক উভয়কে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যদি মহিলা স্বামীর প্রতি অকারণে রাগ করে এবং তা অতি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এতে মহিলার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। আর স্বামীর ক্ষমাপ্রাপ্তি লাভ হয়।
(ফেরদাউস ঃ ৩৩২)

## বিধবা নারীর মর্যাদা

২৬। হযরত আওফ বিন মালেক আশজারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে বিধবা নারী বিয়ের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এতীম সন্তানের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করেনি বরং এতীম সন্তানদের লালন-পালনের গুরুভার তার রূপ-লাবণ্য হ্রাস করে দিয়েছে। ফলে তার এতীম সন্তানেরা হয়ত মৃত্যুবরণ করেছে অথবা সক্ষম ও স্বাধীন হয়ে গেছে। এ ধরনের বিধবা নারী বেহেশতে আমার এত নিকটে আবস্থান করবে যেমন শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল। (আবু দাউদ)

উল্লেখ্য, মহিলাদের এ ফযিলত-মর্যাদা তখনই অর্জিত হবে যদি বিয়ের দরুন সন্তানের জীবন বিপর্যস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়।[১]

## মিথ্যা

২৭। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) রাসূলুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মিথ্যা বলা শুধু প্রয়োজনে তিনটি ক্ষেত্র ব্যতিত একেবারেই হারাম। প্রথমত, নিজের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। তৃতীয়ত, দুই মুসলমানের মধ্যে আপোস রফার ক্ষেত্রে। (মেশকাত)

## কন্যাসন্তানের মর্যাদা

২৮। হযরত আলী (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কন্যাসন্তান হচ্ছে উত্তম সন্তান। কারণ তারা হয় বহুগুণ সম্পন্না নম্রভাষিণী, পিতামাতার সার্বক্ষণিক সেবার কর্মিষ্ঠ। অত্যন্ত আদর সোহাগকারিণী, নম্রপ্রকৃতির ও অত্যন্ত বরকতময়।
(ফেরদাউসঃ পৃষ্ঠা, ২৫৫)

১. নেক খাবেন্দ ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

## আদর-সোহাগে সাম্য

২৯। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বসেছিল-এমন সময় তার এক ছেলে এল, সে তাকে আদর করে চুমু দিয়ে নিজের উরুতে বসালো। তারপর এল তার এক কন্যা, সে তাকে শুধু সামনে বসালো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার উভয় সন্তানের সাথে সমান আচর কেন করনি? অর্থাৎ কন্যাকে চুমু দাওনি উরুতে বসাওনি। (হায়াতুস সাহাবা)

## কন্যাই যার প্রথম সন্তান

৩০। হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, স্বামীর জন্য এমন স্ত্রী অত্যন্ত বরকত সমৃদ্ধ যার মোহরের পরিমাণ স্বল্প এবং কন্যাই যার প্রথম সন্তান। (ফেরদাউস)

## কন্যার ব্যয়ভার গ্রহণ

৩১। হযরত সুরাকা বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে সুরাকা! আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সাদকার কথা বলবো না? আর তা হচ্ছে এই যে, তোমার সেই কন্যার ব্যয়ভার গ্রহণ কর যে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণে তথা তালাক বা স্বামীর ইন্তেকালের দরুন তোমার ঘরে ফিরে এসেছে। এবং তুমি ব্যতিত তার আয়-উপার্জনের কোন পথ নেই। (ইবনে মাজাহ)

## বিধবার জান্নাত

৩২। হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ বর্ণনা করেন, যে মহিলা স্বামীর ইন্তেকালের পর তার সন্তানদের ঘরে বসে গেছে (তাদের লালন-পালনের জন্য) সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (কানযুল ওম্মাল)

## ধৈর্যধারণকারিণী মহিলা

৩৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে মহিলা তার স্বামী কর্তৃক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে (এতে সে অধৈর্য তো হয়ই না) বরং সে বলে "লাব্বাইক' অর্থাৎ আমি হাজির।

তার এই 'লাব্বাইক' বলার দরুন আল্লাহ তাআলা এক ফেরেশতা সৃষ্টি করেন যে আল্লাহর হামদ-ছানা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। এবং এর সমস্ত সাওয়াব সেই মহিলার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়। (ফেরদাউস)

## উত্তম মহিলা

৩৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আনসরী মহিলারা কত উত্তম মহিলা, যারা দীন বোঝার জন্য অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম-আহকাম শেখার ব্যাপারে লজ্জা-শরমকে বাধা হিসাবে গণ্য করে না। (মুসলিম)

## সাহসী ভূমিকা

৩৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ বর্ণনা করেন, জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে সর্বাধিক অগ্রগামী আমার উম্মতের সেইসব মহিলা, যারা (দীনের ব্যাপারে) সাহসী ভূমিকা পালন করে।

## মহিলার দৃষ্টান্ত

৩৬। হযরত আবদুর রহমান বিন আরযি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নেককার পুরুষের বিবাহে নেককার মহিলার দৃষ্টান্ত এরূপ যেন স্বর্ণপাথর খচিত মুকুট বাদশাহরে মস্তকে। আর নেককার পুরুষের বিবাহে বদকার মহিলার দৃষ্টান্ত যেন এক ভারী বোঝা বৃদ্ধের মাথায়। (দুররে মানুসূর)

## দ্বিগুণ সাওয়াব

৩৭। হযরত আবুদল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নসিহত করে বললেন, "হে মহিলারা! তোমাদের অলঙ্কারাদী থেকে হলেও তোমরা সদকা কর।" তাঁর এ উপদেশ শুনে আমি আমার স্বামী আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে (রাঃ) বললাম, আপনি একজন অসচ্চল ব্যক্তি। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদকার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন। (আমরা এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি) আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে জেনে নিন। যদি আমি এ সদকা আপনাকে দেই তবে তা জায়েয হবে কি না? (যদি জায়েয হয় তবে তো উত্তম) নতুবা আমি অন্য কাউকে দান করবো। আমার স্বামী আমাকে বললেন, তুমি নিজেই তা জেনে নাও। তিনি (যয়নব) বলেন, (অবশেষে) আমি নিজেই গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। ঘটনাচক্রে আমার ও তার উদ্দেশ্য ছিল একই ধরনের। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ছিল মানুষের ভীড়। ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত বেলাল (রাঃ) আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলুন যে, দু'জন মহিলা নিজেদের সদকা আপন স্বামী এবং তাদের গৃহের এতীম সন্তানদেরকে দান করতে পারবে কিনা – এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করছে। আর আমরা কে– একথা তাঁকে বলবেন না।

(যাইহোক) হযরত বেলাল (রাঃ) হুজুরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তিনি বললেন, মহিলাদের পরিচয় কি? তিনি বললেন, একজন আনসারী মহিলা আর অপরজন যয়নব। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, কোন যয়নব? তিনি বললেন, ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বললেন, তাদের বলে দাও যে, তাদের জন্য এতে রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব–একটি সদকার আর অন্যটি আত্মীয়তার। (মেশকাত)

## স্বামী আনুগত্যের মর্যাদা

৩৮। হযরত আনসার (রাঃ) বর্ণনা করেন, একব্যক্তি জেহাদ যাওয়ার প্রাক্কালে নিজের স্ত্রীকে নসিহত করলেন, যেন সে ঘরের উপরের তলা থেকে নীচের তলায় না আসে। অথচ মহিলার পিতা সেই ঘরের নীচের তলায় থাকতেন। (একদিন) হঠাৎ তার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করে পিতার সেবা শুশ্রূষার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ হে মহিলা! আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের স্বামীর নির্দেশ মান্য কর।

কিছুদিন পর তার পিতার ইন্তেকাল হয়। মহিলা তার পিতার (মৃত্যু পরবর্তী জরুরী কর্ম-ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের) জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বিতীয়বারের মত অনুমতি চাইলো। কিন্তু তিনি পূর্বের মত এবারও নিষেধ করলেন এবং স্বয়ং উপস্থিত হলেন। এবং কাফন-দাফনের পর সেই মহিলার কছে এ কথা বলে সুসংবাদ দিলেন যে, স্বামীর আনুগত্য প্রকাশের দরুন আল্লাহ তাআলা তোমার পিতাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (দুররে মানসূর)

## স্ত্রী সহবাসের বিনিময়

৩৯। হযরত আবু যর (রাঃ) হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র এরশাদ বর্ণনা করেন, তোমাদের জন্য নিজের স্ত্রী সহবাসের বিনিময়ে রয়েছে সাওয়াব। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের যৌনবাসনা চরিতার্থ করে থাকি তবুও কি তাতে সাওয়াব রয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি একথা জান না যে, যদি তোমাদের এ বাসনা কোন হারাম পন্থায় চরিতার্থ করতে তবে নিশ্চয়ই এতে গুনাহ্ হতো? সুতরাং যদি তা হালাল পন্থার চরিতার্থ হয় তবে এতে সাওয়াব মিলবে। (মুসলিম)

## মায়ের পদতলে

৪০। হযরত আনাস (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, (যারা জান্নাত অন্বেষণ করে তাদের জন্য) জান্নাত মায়ের পদতলে! (কানযুল ওম্মাল)